Tobu-O Ekdin by Sumanta Aslam

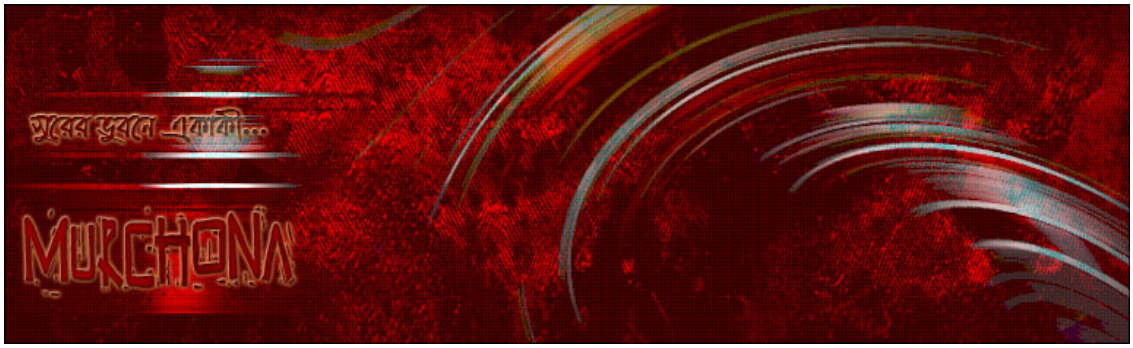

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

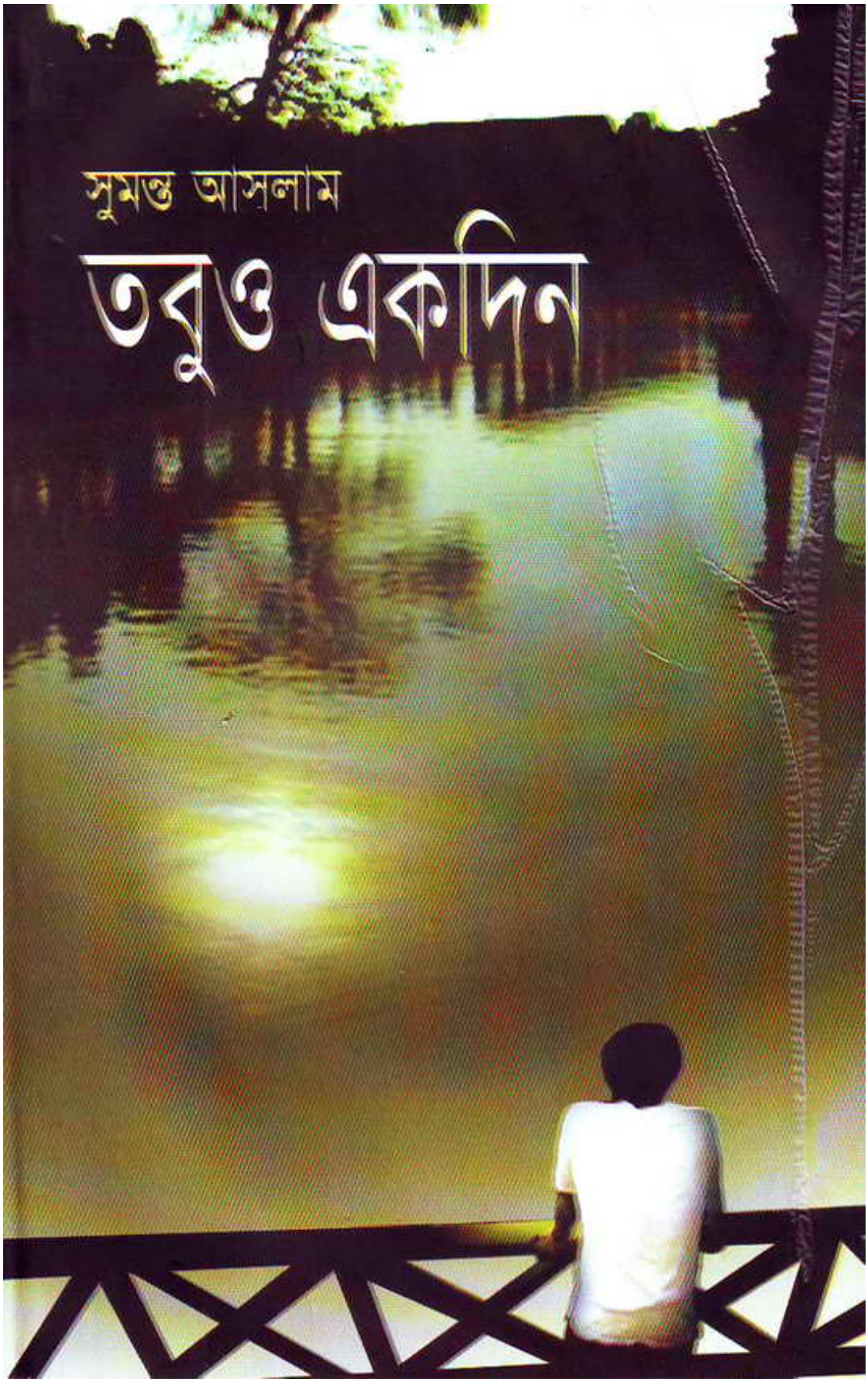
সুমন্ত আসলাম
তবুও একদিন

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

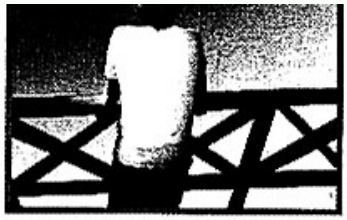

লোকটা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'এটা আপনি কী বললেন, আপনার মাথা ঠিক আছে তো!'

চেয়ারে বসে আছেন লোকটা। কিছুটা উপুড় হয়ে তার চোখ বরাবর মাথাটা এগিয়ে দিলাম আমি। তারপর হালকা গম্ভীর গলায় বললাম, 'দেখেন তো ঠিক আছে কি না।'

আগের চেয়েও অবাক হয়ে লোকটা আমার দিকে তাকালেন, 'আপনার মাথা ঠিক আছে কি না সেটা আমি কীভাবে বলব।'

সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি। কপাল কুঁচকে আছেন লোকটা। সারা মুখে বিরক্তি। আমি মুখটা হাসি হাসি করে বললাম, 'ভাইজান, আমি সত্যি বলছি আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নাই।'

'টাকা-পয়সা নাই তো খেলেন কেন?'

'খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি, অনেক সুন্দর প্রশ্ন।' মুখটা আরো হাসি হাসি করলাম আমি। তারপর লোকটার দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কী করব বলুন, প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল। আর একটু হলে বোধহয় পেটের ভেতরের সব কিছু হজম হয়ে যেত। ব্যাপারটা তাহলে কেমন হয়ে যেত না-আমার পেট আছে, কিন্তু পেটের ভেতর নাড়ি-ভুঁড়ি কোনো কিছুই নেই, একেবারে ফাঁকা!'

মুখটা কঠিন করে ফেললেন লোকটা। তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমিও মুখটা কঠিন করে ফেললাম। তারপর দার্শনিকের মতো ভঙ্গি করে অদ্ভুত রকমের স্বরে বললাম, 'আপনি কি জানেন, ক্ষুধা লাগলে মানুষের প্রথমে কার কথা মনে পড়ে?'

ফ্যালফ্যাল করে লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটু ভালো করে তার দিকে তাকালাম। খুব পাতলা একটা শার্ট পরেছেন তিনি, সাদা ধরনের শার্ট। শার্টের নিচে পরা গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে। বুকের কাছে দুটো বোতাম খোলা, ভারী একটা সোনার চেন দেখা যাচ্ছে সেখান দিয়ে। চেনের নিচে গোল করে আরবি অক্ষরে আল্লাহু লেখা। শার্টের পকেটের ফাঁক দিয়ে দামি সিগারেটের একটা প্যাকেট বের হয়ে আছে। আমি খুব বিনয়ী গলায় বললাম, 'খাওয়ার পর সিগারেট খাওয়া উত্তম, যদিও।'

www.murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

কথাটা শেষ করতে হলো না। তার আগেই পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিলেন তিনি। একটা জিনিস আমি অনেকদিন ধরে খেয়াল করেছি— কারো কাছে যদি দুটো টাকা চাওয়া যায়, তাহলে টাকাটা সাধারণত দিতে চায় না সে। কিন্তু সে যদি সিগারেটখোর হয় এবং তার কাছে যদি সিগারেট চাওয়া যায়, তাহলে সিগারেটটা দিয়ে দেয় নির্দ্বিধায়। এটা কি একজন নেশাখোরের প্রতি আরেকজন নেশাখোরের সহমর্মিতা ? অনেকদিন ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে আগের চেয়েও বিনয়ী গলায় বললাম, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভাইজান— দিনে আপনি কত প্যাকেট সিগারেট খান ?'

কিছুটা কর্কশ গলায় লোকটা বললেন, 'তা দিয়ে আপনার দরকার কী ?

'না, দরকার তেমন নাই।'

'তাহলে ?'

'না, একটু জানতে ইচ্ছে করছে আর কী।'

'আড়াই থেকে তিন প্যাকেট।'

'এক প্যাকেট সিগারেটের দাম কত ?'

'সত্তর টাকা।'

'এক প্যাকেট সিগারেটের দাম সত্তর টাকা হলে তিন প্যাকেট সিগারেটের দাম হয় দুইশ দশ টাকা। সর্বনাশ!'

'সর্বনাশের কী হলো ?'

'এত বড় একটা হোটেলের মালিক হয়ে- ।'

কথাটা শেষ করার আগেই লোকটা বললেন, 'না, আমি মালিক না, আমি এই হোটেলের ম্যানেজার।'

'একজন ম্যানেজার হয়ে আপনি দুইশ দশ টাকা কেবল সিগারেটের পেছনে খরচ করেন! একদিনে দুইশ দশ টাকা মানে মাসে ছয় হাজার তিনশ' টাকা। আপনি জানেন, এই টাকা দিয়ে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সাত-আটজন মানুষ পুরো মাস খেতে পারবে?'

'সেটা আমার জানার দরকার কি ? আপনি খেয়েছেন, এখন খাবারের দাম দিয়ে বিদায় হোন।'

ম্যানেজার সাহেবের দিকে সিগারেটটা এগিয়ে দিলাম আমি। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন তিনি। তাকে আরো অপ্রস্তুত করার জন্য আমি বললাম, 'যারা প্রতিদিন এতগুলো টাকা অপচয় করে, স্রেফ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে, তাদেরকে আমার মানুষ মনে হয় না। প্রতিদিন এদেশে অনেক মানুষ না খেয়ে থাকে, স্রেফ পানি খেয়ে থাকে।'

'অনেক মানুষ না খেয়ে থাকে তো আমি কী করব ?'

'আপনার কিছু করতে হবে না, আপনি কিছু করতেও পারবেন না।' রুঢ় স্বরে কথাটা বলেই গলাটা নরম করে ফেললাম আমি, 'আপনি বরং আপাতত দুটো কাজের যে-কোনো একটা কাজ করতে পারেন।'

'কী ?'

'যেহেতু আপনার হোটেলে খেয়েছি আমি, কিন্তু সে খাবারের দাম দিতে পারছি না, সেহেতু আপনি আমাকে দিয়ে আপনার এটো থালা-বাসন গ্লাস ধুয়ে নিতে পারেন।'

ম্যানেজার সাহেব খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, 'থালা-বাসন ধুতে পারবেন আপনি ?'

ধক করে ওঠে বুকের ভেতরটা। এখন থালা-বাসন ধুতে বলবে নাকি লোকটা! মুখে আতঙ্ক ভর করা একটা হাসি এনে আমি নিজ প্রস্তাবটা সংশোধন করে বলি, 'এতে একটা অসুবিধা হতে পারে।'

'কী অসুবিধা ?'

'কোনো দিন এসব কাজ করিনি তো।'

'তাতে অসুবিধা কোথায় ?'

'অসুবিধা নাই, কিন্তু কাচের এসব জিনিসপত্র ধুতে নিয়ে দেখা গেল এক মিনিটের মধ্যে কয়েকটা জিনিস ভেঙে ফেললাম।'

কী যেন ভাবলেন ম্যানেজার সাহেব। তারপর কিছুটা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'এটা একটা অসুবিধাই তো। আপনি তো দুটো কাজের কথা বলেছিলেন, আরেকটা কাজ কী ?'

'আরেকটা কাজ হলো আপনি আমাকে বেঁধে রাখতে পারেন।'

'বেঁধে রাখব!'

'জি। মোটা রশি দিয়ে আপনার দোকানের সামনের ওই লাইটপোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারেন। এতে একটা সম্ভাবনার কথা হলো— আমার এই অবস্থা দেখে পাবলিক আমাকে দু'একটা করে টাকা দান করতে পারে, এভাবে বেশ কিছু টাকা জমা হলে সেখান থেকে আমি আপনার খাবারের দাম দিতে পারি। অসুবিধার কথা হলো-আমার আবার ঘনঘন টয়লেট পায়। একটু পর পর রশি খুলে আমাকে টয়লেটে নিয়ে যেতে হবে, টয়লেট শেষে আবার এই লাইটপোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে।'

'না না এটা অসম্ভব।' কথা বলতে বলতে ম্যানেজার সাহেব আমার হাতের দিকে তাকালেন। সোনালি রঙের একটা ঘড়ি আছে আমার হাতে। আমি একবার

www.Murchona.com

ঘড়ির দিকে তাকালাম আবার ম্যানেজার সাহেবের চোখের দিকে তাকালাম। তারপর ঘড়িটা খুলে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আপনি বরং এটা রাখুন।'

'এটা দিয়ে আমি কী করব ?'

'কী করবেন মানে, হাতে দিয়ে রাখবেন। আপনার হাতে যে ঘড়িটা আছে সেটা ফেলে দিন, তারপর এটা পরুন। এটা অনেক দামি ঘড়ি। যে লোক প্রতিদিন দুইশ দশ টাকা সিগারেট খেয়ে পুড়িয়ে ফেলে তার হাতে ওরকম সস্তা ঘড়ি মানায় না। এটা মানায়। নিন, কোনো দিন টাকা জোগাড় করতে পারলে ঘড়িটা ফেরত নিয়ে যাব।'

'না, এ ঘড়ি আমি নেব না।'

'কেন! আপনার খাবারের চেয়ে এ ঘড়ির দাম অনেক বেশি। আপনি জানেন, এ ঘড়িটা আমাকে কে দিয়েছে ?'

ম্যানেজার সাহেব চোখ দুটো সামান্য বড় বড় করে বললেন, 'কে ?'

আমি মুচকি হাসলাম। অবাক কাণ্ড! ম্যানেজার সাহেব তার মুখটা এতক্ষণ গম্ভীর করে রেখেছিলেন, তিনিও এখন মুচকি হাসছেন। আমি একটু ঝুঁকে এসে তার কানের কাছাকাছি মুখটা নিয়ে বললাম, 'জানেন, এ ঘড়িটার সঙ্গে অনেক ভালোবাসা আছে।'

'অ বুঝেছি।' ম্যানেজার সাহেব খিক করে একটা হাসি দিলেন।

'কী বুঝলেন ?'

'এটা আপনার লাভার দিয়েছে।'

'লাভার দিয়েছে মানে!'

'ওই যে বললেন ভালোবাসা আছে।'

'কেন, ভালোবাসা কি কেবল লাভারদের কাছেই থাকে, মা-বাবা-ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে থাকে না ?'

'তা থাকে।'

'তাহলে ?'

ম্যানেজার সাহেব কী একটা বলতে নিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। তিনি আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যান, আপনাকে খাবারের দাম দিতে হবে না, ঘড়িও রেখে যেতে হবে না।'

'খাবাবের দাম দিতে হবে না কেন ?'

ম্যানেজার সাহেব এই প্রথম সারা মুখ আলো করে হাসলেন। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'আপনাকে আমার ভালো লেগেছে, আবার কখনো খিদা লাগলে আমার এখানে এসে খেয়ে যাবেন, কোনো টাকা-পয়সা লাগবে না।'

'ধন্যবাদ, আমি তো এখন খাবারের দাম পরিশোধ না করে যাব না। ঠিক আছে ঘড়ি না রাখেন আমার কাছে একটা জিনিস আছে সেটা রাখেন।'

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আমি একটা মোবাইল ফোন বের করলাম। ঝকঝক করছে ফোনটা। সম্ভবত নতুন কেনা হয়েছে এটা। প্রচণ্ড ক্ষুধায় ফুটপাত দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিলাম, হঠাৎ দেখি একটা গাছের গোড়ায় পড়ে আছে এটা। আশপাশে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। সকলের হাতেই এখন এ জিনিসটা দেখা যায়, কিন্তু আমি এখনো এ জিনিসটা ছুঁয়ে দেখিনি। কীভাবে এটা দিয়ে কল করতে হয়, কল রিসিভ করতে হয়, তার কিছুই জানি না। একটু ভাবার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, জিনিসটা নিয়ে রাখি, ফোনের মালিক নিশ্চয় খোঁজ করবে, তখন তাকে ফেরত দেয়া যাবে। দুই ঘণ্টা ধরে পকেটে নিয়ে ঘুরছি, কিন্তু কেউ খোঁজ করেনি এখনো।

মোবাইল সেটটা ম্যানেজার সাহেবকে দিয়ে বললাম, 'এটা রেখে দিন।'

'আপনার ফোন আমি নেব কেন?'

'ফোনটা আমার না।'

'কার?'

'রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় কুড়িয়ে পেয়েছি। রেখে দিন, কেউ খোঁজ করলে প্রমাণ নিয়ে ফেরত দেবেন, তার আগে এ দামি জিনিসটা ফেরত দেয়ার পুরস্কার স্বরূপ খাবারের দামটা রেখে দেবেন। হারিয়ে যাওয়া এত দামি জিনিসটা খুঁজে পাওয়ার পর নিশ্চয় ওই সামান্য কয়টা দিতে মানা করবে না।'

'না, এটা আমি রাখতে পারব না।'

'ভাইজান, এটা আমিও রাখতে পারব না। জীবনে আমি এ জিনিস ধরিনি। শুনেছি এটার জন্য নাকি কার্ড কিনতে হয় কিংবা মাসে মাসে বিল দিতে হয়। এবার আপনিই বলুন, যে মানুষ হোটেলে খেয়ে দাম দিতে পারে না, সে কীভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে? প্লিজ, এটা আপনি রেখে দিন।'

ম্যানেজার সাহেবের হাতে জোর করে ফোনটা গুজে দিলাম আমি। ফোনটা পাশে রেখে দিয়ে তিনি সেই সিগারেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন, সিগারেটটা খান।'

'আমি কখনো সিগারেট খাইনি, আপনার পকেটে সিগারেটের প্যাকেট দেখে এমনি বলেছিলাম। চার টাকা দামের একটা জিনিস আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলার সাহস অনেকের হয় না।'

কিছুটা ছলছল করে ওঠে ম্যানেজার সাহেবের চোখ দুটো। দু'হাত এগিয়ে দিয়ে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে একটু থেমে থেকে বলেন, 'ভাইজান, আমার নাম সাত্তার মিয়া, আপনার নামটা জানতে পারি?'

www.Murchona.com

'অবশ্যই। আমার নানার নাম ছিল নজির রহমান। তার মতো ভালো মানুষের নজির নাকি অত্র এলাকায় ছিল না। মা তার বাবার নাম অনুসারে আমার নামও রাখে নজির রহমান। কিন্তু একদিন দেখি, আমার মধ্যে ভালো মানুষের কিছু নেই। আমার মধ্যে রাগ আছে, হিংসা আছে, ঈর্ষা আছে, লোভ আছে, লালসা আছে— ভালো মানুষের কোনো নজিরই আমার মধ্যে নেই। তাই একদিন আমার নামটা বদলে ফেললাম।'

'বদলে কী নাম রাখলেন ?'

'মা শখ করে নজির রহমান নাম রেখেছিল। তাই নামটা সম্পূর্ণ না বদলিয়ে নজির-এর প্রথম অক্ষর 'ন'টা রেখেছি। আর দেশে এখন প্রচুর রহমান টাইটেলের মানুষ আছে, সেগুলোর মধ্যে কতগুলো রেহমান হয়েছে, কতগুলো রাহমান হয়েছে, আমিও নব্য লেখকদেও মতো নিজ নামটা সম্পাদিত করে রহমানকে করেছি রুহমান। সবশেষে আমার নাম দাঁড়িয়েছে দন্ত্যন রুহমান। আপনি আমাকে দন্ত্যন বলে ডাকতে পারেন।'

'খুবই উত্তম নাম।' ম্যানেজার সাহেব বিগলিত একটা হাসি দিলেন।

'উত্তম কই দেখলেন ভাইজান। দন্ত্যন নাম শুনে অনেকে ঠাট্টা করে বলে দন্ত্যন মানে কি— নবাব, নওজোয়ান, না নচ্ছার ?'

'আপনি কী বলেন ?'

'আমি কিছুই বলি না, মুচকি মুচকি হাসি।'

'ভালো। আসেন, আমরা এক সঙ্গে এখন এক কাপ চা খাই। চা খাইতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নাই। চা খাইতে খাইতে আপনাকে আমার মোবাইল নম্বরটা দেই, আমাকে যে এখন মোবাইলটা দিলেন এটার নম্বরটাও দিয়ে দেই।'

'এটার নম্বর কীভাবে দেবেন ?'

'খুব সহজ। এ ফোন থেকে আমার মোবাইলে ফোন দিলেই এ ফোনের নম্বরটা আমার মোবাইলে উঠে পড়বে, তখন লিখে নিলেই হবে। বক্কার—।' হোটেলের একটা বয়কে ডাক দিলেন ম্যানেজার সাহেব। বক্কার কাছে আসতেই তিনি বললেন, 'একটা টেবিলে বগুড়ার দই, সিরাজগঞ্জের সন্দেশ, রাজবাড়ীর মিষ্টি, কুমিল্লার রসমালাই দে, এখনই।'

পেটের ভেতর গুড়গুড় করে ডাক দিয়ে উঠল আমার। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতর কেমন যেন রসও জমে গেল। আমার সারাজীবনে ওই জিনিসগুলোর একটা জিনিসও খাইনি, এখন একসঙ্গে চার-চারটা জিনিস খেতে পারব। আনন্দে চোখে পানি এসে গেল আমার। ম্যানেজার সাহেব হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দন্ত্যন ভাই, কাঁদছেন কেন?'

আমি চোখ মুছতে মুছতে বললাম, 'হঠাৎ করে মা আর বাবার কথা মনে পড়ল তো।'

বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। খুব মনোযোগ দিয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ। শেষে ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন আরো একটু। বুকের কাছে আমার শার্টের একটা বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কেমন আছেন আপনি ?'

বাবা সহজে রাগেন না। যদি সামান্যক্ষণের জন্য রেগে যান তখন তিনি আমাদের সবাইকে আপনি আপনি করে বলেন। বাবা এখন আমাকে আপনি করে বলছেন, তার মানে বাবা রেগে আছেন। মাথাটা নিচু করে ফেললাম আমি। পরক্ষণেই বাবার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমার কী মনে হয় ?'

'আমার মনে হওয়া না হওয়া নিয়ে নিয়ে আপনার কি কিছু আসে যায় ?'

মাথা উঁচু নিচু করতে করতে আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

'তাই!' ম্লান একটা হাসি দিলেন বাবা। তারপর বেশ কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন, 'এবার কত দিন হলো ?'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে আমি বললাম, 'একমাস চৌদ্দ দিন।'

'তার মানে প্রায় দেড় মাস।'

আবার মাথা উঁচু-নিচু করলাম আমি।

'কেমন লাগল এ কয়দিন ?'

'মোটামুটি।'

'মোটামুটি কেন ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কয়দিন না খেয়ে থাকা হয়েছে ?'

আমতা আমতা করে আমি বললাম, 'হয়েছে...।'

'না, আমি জানতে চাচ্ছি ঠিক কয়দিন।' কিছুটা স্পষ্ট স্বরে বললেন বাবা।

'তিনদিন। ঠিক পর পর না।'

'না খেয়ে থাকতে কেমন লাগে ?'

www.Murchona.com

'অদ্ভুত। পৃথিবীর সব কিছু তখন খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। রাস্তার ইটগুলোকে মনে হয় কেক, ইটের টুকরোগুলোকে মনে হয় ভাত, ঘাসগুলো সবজি, আকাশের মেঘগুলো ফিরনি আর ড্রেনের পানিগুলোকে মনে হয় শরবত। তখন সবকিছুকে সুস্বাদু মনে হয়, সব একসঙ্গে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।'

বাবার চোখ দুটো ভিজে উঠেছে। সেই টলটল চোখ নিয়ে বাবা এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন যেন তিনি আমাকে এই প্রথম দেখছেন কিংবা বহু বছর পর হারিয়ে থাকার পর তিনি আমাকে খুঁজে পেয়েছেন। অপরাধবোধে বুকটা ভরে যাচ্ছে আমার। আমি বাবার একটা হাত ধরে বললাম, 'বাবা, তুমি কাঁদছ ?'

'আমি কি ভুল করছি, আমার কি এখন হাসা উচিত ? আমার সন্তান কয়দিন পর পর কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, না খেয়ে থাকে, অনেকদিন পর পর বাসায় ফেরে-এসব দেখে শুনে আমার হাসা উচিত ?' বাবা আমার হাত থেকে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমাকে বলেন, 'আপনি বলেন আমার হাসা উচিত ?'

বাবার হাতটা আবার ধরার চেষ্টা করি, কিন্তু বাবা আর সে সুযোগটা দেন না। তিনি আরো কিছুক্ষণ আমার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে আস্তে আস্তে তার ঘরের দিকে পা বাড়ান। রোবটের ছন্দময় হাঁটার মতো বাবার ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটা দেখতে দেখতে চোখে পানি এসে যায় আমার।

মাঝে মাঝেই আমি এমন করি— কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে বের হয়ে যাই। কিছুদিন বাইরে থাকার পর আবার বাসায় ফিরে আসি। কয়েকদিন থাকার পর মনটা আবার কেমন যেন করে ওঠে, চুপচাপ বাসা থেকে বের হয়ে পড়ি আবার।

বাসা থেকে বের হয়ে আসার সময় আমার কাছে প্রায়ই কোনো টাকা-পয়সা থাকে না। কিন্তু কোনো রকম চিন্তা না করে আমি বের হয়ে যাই। টাকার অভাবে এ পর্যন্ত আমি কম করে হলেও মোট আটাশ-উনত্রিশ দিন না খেয়ে থেকেছি। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধা হতো, এখন আর তেমন হয় না। প্রচণ্ড খিদে লাগলে তখন চুপ করে বসে থাকতে হয়। খিদার মাত্রা চরমে ওঠার পর এক সময় দেখা যায় খিদাটা কেমন যেন কমে এসেছে। পেটের ভেতর শূন্যতাটা আর নেই, কী যেন এসে দখল করে ফেলেছে জায়গাটা। এভাবে কাটিয়ে দেয়া যায় অনেকক্ষণ। কিন্তু এরই মাঝে পেটে যদি ছোট্ট একটা কিছু দেয়া হয় তাহলে খিদাটা এবার এমনভাবে জেগে ওঠে, মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত কিছু এক খাবলায় খেয়ে ফেলি।

মা প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কখন এসেছিস বাবা ?'

মায়ের মুখটার দিকে আমি গভীর চোখে তাকাই এবং প্রতিবার যা হয় এবারও তাই হলো— চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে ওঠে আমার। সব না পাওয়া দূর হয়ে যায়

কেবল এ মুখটা দেখলে। মা আঁচল দিয়ে আমার মুখটা মুছে দিতে দিতে বলে, 'মুখটা এতো শুকনা লাগছে কেন তোর ?'

'কই শুকনা লাগছে ?'

'কত শুকিয়ে গেছিস তুই।'

'এ তোমার চোখের ভুল মা।'

'কিছু খেয়েছিস ?'

'অনেক কিছু।'

'অনেক কিছু! অনেক কিছু তোকে কে খাওয়াল ?'

'তা তো বলা যাবে না।' হাসতে হাসতে আমি মার দিকে তাকাই। মা মুখটা আরো ম্লান করে ফেলে।

'নজির শোন—।' মা আমার দিকে তাকাতেই আমি বলি, 'কী বললে?'

'কী আর বললাম!'

'আমাকে কী বলে ডাকলে ?'

'কেন তোর নাম বলে।'

'আমি না তোমাকে বলেছি ও নামে আমাকে ডাকবে না।'

'তাহলে কোন নামে ডাকব ? তোর নাম নজির, তাই নজির বলে ডাকছি।'

'না, আমার নাম নজির না।'

'নজির না তো কী ?'

'দস্ত্যন।'

'দস্ত্যন! এই বিদঘুটে নাম আমি বলতে পারব না।'

কিছুটা রেগে গেছে মা। আমি মায়ের একটা হাত ধরে হাসতে হাসতে বলি, 'কেন ডাকতে পারবে না ?' মায়ের হাতটা ঝাঁকুনি দেই আমি, 'মা, আমাদের সামনে প্রতিদিন এতো কিছু এসে দাঁড়ায়, আমরা তখন ভুলে যাই নিজেদের, আমরা ভুলে যাই আমরা মানুষ। প্রতিদিন জন্মাই আমরা, প্রতিদিন মরেও যাই। আমরা প্রতিদিন পরীক্ষার সম্মুখিন হই, প্রতিদিন বদলাই। একদিন বদলাতে বদলাতে আমরা আর মানুষ থাকি না।' একটু থেমে গিয়ে আমি বলি, 'আমাদের কারো মাঝেই এখন আর তুমি কোনো কিছুর কোনো নজির খুঁজে পাবে না মা। আপা কই মা?'

'মনু তো স্কুলে গেছে।'

'আপার এই নতুন চাকরিটা কেমন লাগছে ?'

'কী জানি, ভালোই তো বলে।।'

'আপা তো বোধহয় গত মাসে প্রথম বেতন পেয়েছিল, আমি তো তখন ছিলাম না। প্রথম মাসের বেতন দিয়ে কী করেছে মা ?'

'কিছু একটা তো করেছিই।' আপা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়। তারপর আমার মুখের দিকের ভালো করে তাকিয়ে বলে, 'আজ তোকে একটা প্রশ্ন করব।'

'আমি জানি তুমি কী প্রশ্ন করবে।'

'তাহলে উত্তরটা দে।'

'তোমার এ প্রশ্নের উত্তর তোমাকে আমি কোনোদিনই দিতে পারব না আপা, কোনো দিনই না।'

'কেন ?'

'তা তো জানি না।'

'খুব সহজ একটা প্রশ্ন।'

'তুমি তো শিক্ষকতা করো, তুমি তো ভালো করেই জানো, সহজ প্রশ্নের উত্তর না জানলেই সেটা কঠিন হয়ে যায়।'

'তুই জানিস না।'

'জানি।' একটু থেমে আমি আপার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলি, 'এবং তুমিও জানো।'

'আমি জানি! তুই কেন মাঝে মাঝে বাসা থেকে উধাও হয়ে যাস, এটা আমি জানি!'

শব্দ করে হাসতে নিতেই খেয়াল করি আমি হাসতে পারছি না। বুকের ভেতর কেমন একটা চাপ অনুভব করি। বেশ কিছুক্ষণ পর আমি আবার আপার চোখের দিকে তাকাই এবং ম্লান হেসে বলি, 'হ্যাঁ জানো।'

আপার অবাক দুটো চোখ দেখে আমার আরো হাসি পায়।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠেই দেখি মিতি আর লুবা বসে আছে আমার পাশে। ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কিছুটা উপুড় হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে ওরা। বিব্রত হয়ে বেশ দ্রুত বিছানা থেকে উঠে বসতেই মিতি বলল, 'ভাইয়া, তোর জন্য দুটো খবর আছে।'

'তার আগে বল, তোরা এভাবে কী দেখছিলি ?'

'কি আর দেখব, তোকে দেখছিলাম।'

'আমাকে দেখার কী আছে!'

'কিছুই নেই।'

'তাহলে ?'

'কোচিং থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মা কান্না কান্না মুখ করে বলল, 'তোর চেহারাটা নাকি শেষ হয়ে গেছে, তুই নাকি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিস, তাই দেখতে এলাম।'

'তা এখন কী মনে হচ্ছে ?'

'মা মিথ্যা বলেছে, তুই আগের মতোই আছিস।'

লুবার নাক টেনে আমি বললাম, 'তোর কী মনে হয়রে পিচ্চি ?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ভালো করে দেখ।'

লুবা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল। মজার কিছু দেখার মতো আমাকে কিছুক্ষণ দেখে ঠোঁট দুটো উল্টিয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না ভাইয়া।'

'ভালো, সব কিছু না বোঝাই ভালো।' আমি আবার লুবার নাক টেনে বললাম, 'তুই এবার কোন ক্লাসে যেন রে পিচ্চি ?'

'ভাইয়া, দুটো অবজেকশন!'

'অবজেকশন! কিসের অবজেকশন ?'

'এক. আমি বড় হয়ে গেছি, তুমি আর আমাকে পিচ্চি বলবে না।'

'দুই ?'

'দুই হচ্ছে— তুমি প্রতিবার বাসায় ফিরেই এ কথাটা জিজ্ঞেস করো আমি কোন ক্লাসে পড়ি। এটা আর জিজ্ঞেস করবে না।'

'ঠিক আছে করব না, প্রমিজ। তার আগে বল— তোকে পিচ্চি না বললে কী বলব ?'

'আমার একটা নাম আছে ভাইয়া।'

'সে তো জানি।'

'তুমি আমার সে নাম ধরে ডাকবে।'

'তুই কি জানিস তোর লুবা নামটা উল্টালে কী হয় ?'

'জানি।'

'কেমন হাস্যকর একটা ব্যাপার না ?'

'মোটেই হাস্যকর না, মানুষ তো কারো নাম উল্টো করে বলে না।'

'তা ঠিক। ও ভালো কথা, মনে পড়েছে, তুই ক্লাস এইটে পড়িস, বাংলায় যাকে বলে অষ্টম শ্রেণী, ঠিক ?'

'থ্যাংকু।'

মিতির দিকে তাকালাম আমি। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছে ও। আমি ওর মাথায় ছোট্ট একটা চাটি দিয়ে বললাম, 'কী ভাবছিস? নিশ্চয় রেজাল্টের কথা, না ?'

মাথা উঁচু নিচু করে মিতি বলল, 'হ্যাঁ।'

'এতে ভাবাভাবির কি আছে ? ম্যাট্রিকে ভালো করেছিস, ইন্টারমিডিয়েটেও ভালো করবি। আমি এখনই বলে দিতে পারি তোর রেজাল্ট কী হবে ?'

লুবা খুব আগ্রহের স্বরে বলল, 'কী রেজাল্ট হবে, বলো তো ভাইয়া।'

'না, এখন না।' মিতির দিকে তাকালাম আমি, 'জানিস নাকি, তোর রেজাল্ট হবে কবে ?'

'আরো দু'মাস লাগতে পারে।'

'সে তো অনেক দেরি।'

'দেরি আর কই দেখতে দেখতে চলে যাবে।' মিতি একটু থেমে বলে, 'ভাইয়া তোকে একটা কথা বলব?'

'বল।'

'তুই আর লেখাপড়া করবি না ?'

মিতির চোখের দিকে সরাসরি তাকাই আমি। ওর চোখ টলটল করছে। এটা হচ্ছে কান্নার ঝড় তোলার ওর পূর্ব প্রস্তুতি। আমি জানি, একটু পর ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়বে, তারপর ফোত ফোত শব্দ করে নাক টানবে। ঠিক সেই মুহূর্তটাতে আমি মিতিকে চিনতে পারব না, একেবারেই না। এত কঠিন একটা মেয়ে মামুলি একটা ব্যাপার নিয়ে কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে যাবে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না।

আচ্ছা, সংসারের একমাত্র ছেলে লেখাপড়া করে না, এটা কি একটা মামুলি ব্যাপার ? জগতে তো অনেকেই লেখাপড়া করে না, তাহলে ?

মিতি খুব কঠিন একটা মেয়ে। ক্লাস নাইনে অঙ্কে একবার ও প্রথম হতে পারেনি। যে প্রথম হয়েছিল তার থেকে তিন নাম্বার কম পেয়েছিল ও। বাসায় এসে তারপর ওর সেকী কান্না! তারপরের ব্যাপারটা আরো ভয়ঙ্কর। মিতি ওর অঙ্ক বই আর খাতা নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। সারাদিন আর দরজা খোলে না, খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ। আমরা সবাই চেষ্টা করি, ওকে তবু বের করতে পারি না। মা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল, আপা পুলিশকে খবর দিল, তবু কিছু হয় না। এদিকে বাবাকেও অফিসে পাওয়া যাচ্ছে না। এ অফিস শেষে বাবা আরেকটা অফিসে পার্ট টাইম জব করেন, কিন্তু আমরা সে অফিসও চিনি না, সে অফিসের টেলিফোন নম্বরও জানি না। রাত সাড়ে নয়টার দিকে বাবা বাড়িতে এসে খবরটা শুনেই হো হো করে হাসতে থাকেন। তারপর মিতির ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলেন, 'মারে, সারাদিন কাজ করার পর আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে রে মা। তোদের ছাড়া তো আমি কোনোদিন একা একা খাইনি। তাই তুই যদি ঘর থেকে বের না হোস, আমার সঙ্গে বসে না খাস, আমিও আজ খাব না।'

বাবা মিতির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পর ঘর থেকে বের হয়ে এলো মিতি। মাথার চুল উস্কোখুস্কো ওর, মুখটা শুকিয়ে গেছে। বাবা ওকে দেখে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার গুণবতী মেয়েটা মাত্র তিন নাম্বার কম পেয়েছে, তাতে কি হয়েছে, আগামীবার ও দশ নাম্বার বেশি পাবে।' বাবা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'তোমরা দেখে নিও, ও সত্যি সত্যি দশ নাম্বার বেশি পাবে।' মিতি পরেরবার দশ না, বার নাম্বার বেশি পেয়েছিল।

মিতি কাঁদছে। আমি ওর মাথায় একটা হাত রেখে বললাম, 'আমার নাকি দুটো খবর আছে।'

সাদা একটা খাম এগিয়ে দিয়ে মিতি বলল, 'তোর কাছে এ চিঠিটা এসেছে।' মিতি চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'এ চিঠিটা কে লিখেছে জানিস ?'

'আমি কী করে বলব, আগে চিঠিটা খুলি।'

'আমি কিন্তু জানি।'

'তুই জানিস!'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে ?'

'সেটা বলা যাবে না।'

'ঠিক আছে, দ্বিতীয় খবরটা বল।'

'বদিউল আঙ্কেল তোকে দেখা করতে বলেছেন।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ, বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।'

আমার ঘরের জানালা দিয়ে পাশের বাসাটা দেখা যায়, চার তলা বাসা। বাসাটায় মাত্র তিনজন মানুষ থাকে— বদিউল আঙ্কেল এবং তার দু'মেয়ে অর্পা আর অর্ণা। জানালা দিয়ে ভালো করে তাকাতেই দেখি অর্পা ওর ঘরের জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই মুচকি একটা হাসি দিল ও। সাধারণত কোনো হাসির বিপরীতে সামান্য হলেও হাসি দিতে হয়, কিন্তু আমি হাসতে পারলাম না। কেমন যেন আপনা আপনি গম্ভীর হয়ে এলো আমার মুখটা। অর্পাদের বিশাল বাড়িটার বিশাল একটা ছায়া পড়েছে আমাদের বাড়িতে। আমি সে ছায়াটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম নিঃশব্দে।

বদিউল আঙ্কেলের বাসায় ঢোকার আগে আমি প্রতিবার কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকি তার বাসার সামনে। আজও দাঁড়িয়ে আছি। আমার এ দাঁড়িয়ে থাকা দেখে বাসার দারোয়ান মোখলেস ভাই এগিয়ে এসে বললেন, 'দস্ত্যন ভাই, কী দেখছেন এভাবে ?'

বাসার বাইরের বিশাল কাঠের দরজাটা থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি মোখলেস ভাইয়ের দিকে তাকালাম। মোখলেস ভাই আমার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। আমিও মুখটা হাসি হাসি করে ফেললাম। কাঠের দরজাটার মতোই চকচক করছে মোকলেস ভাইয়ের মুখটাও। অথচ প্রথম যেদিন এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিন তার মুখটা এরকম ছিল না।

আমাদের বাড়ির পাশে হঠাৎ গজে ওঠা ঘাসের মতো একটা বাড়ি উঠতে দেখে আমি সে বাড়ির সামনে একদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। বদিউল আঙ্কেলকে তখন আমরা চিনি না। তিনি হঠাৎ জায়গাটা কিনে হঠাৎই বাড়ি করতে শুরু করেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি আর ভাবছি ? মানুষের কত টাকা হলে রাতারাতি এরকম একটা বাড়ির কাজে হাত দিতে পারে ? হঠাৎ বাড়ির দারোয়ানটা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'এই মিয়া, এভাবে কী দেখো ?'

দারোয়ানটার দিকে আমি খুব ভাবলেশহীনভাবে তাকালাম। সাধারণত এ সব দারোয়ান শ্রেণীর লোকের সঙ্গে একটু রাগী স্বরে কথা বলতে হয়, প্রথম কথাতেই তাদের ভড়কে দিতে হয়। আমি তা করলাম না। বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে সেভাবে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, 'স্যার, আপনি কি এ বাড়ির মালিক ? খুব সুন্দর হচ্ছে আপনার বাড়িটা।'

চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় করে ফেলল দারোয়ানটা। আমি তার চোখটা আরো বড় বড় করার জন্য বললাম, 'এ বাড়ির কিছু মালপত্র আপনি কাল মধ্যরাতে কার কাছে যেন বিক্রি করলেন দেখলাম, মালগুলো বোধহয় ভালো ছিল না, না ?'

আরো বড় হয়ে গেছে দারোয়ানটার চোখ দুটো। সে কিছু একটা বলতে নিচ্ছিল, আমি তার আগেই তাকে বললাম, 'আমারও এসব জিনিসপত্রের ব্যবসা আছে, আজ রাতে কিছু বিক্রি করবেন নাকি ? করলে রাতে একবার আসি ?'

তোতলাতে তোতলাতে দারোয়ানটা বলল, 'কাল রাতে কই আমি জিনিসপত্র বিক্রি করলাম! আমি তো এ বাসার দারোয়ান।'

এবার আমি চোখ বড় বড় করে ফেললাম, 'আপনি এ বাড়ির মালিক না ?'

কান্না কান্না চেহারা করে দারোয়ানটা বলল, 'না।'

দুর্বল মানুষের ভেতরটা চমকে দেয়ার দুটো পদ্ধতি আছে। হয় তার সঙ্গে খুব ঠাণ্ডা গলায় কথা বলতে হবে, না হয় তার সঙ্গে ধমক দিয়ে কথা বলতে হবে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে গেলাম মধ্যবয়সী লোকটার দিকে। তারপর তার শার্টের কলারটা একটু টোকা দিয়ে খুব ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'তুই আমাকে চিনিস ?'

আগের চেয়েও কান্না কান্না করে ফেলল তার মুখটা, 'না।'

'তিনদিন আগে একটা জোড়া খুন হয়েছে, শুনেছিস ?'

'না।'

'তারও কয়েকদিন আগে একটা লোককে পিটিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটা শুনেছিস ?'

'না।'

'কাল রাতে যে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা ?'

'সেটাও জানি না।'

সকালে পেপারে পড়া ঘটনাগুলো কাজে লাগিয়ে আমি তার দিকে একটু ঝুকে এলাম। তারপর আগের চেয়েও ঠাণ্ডা গলায় কিছুটা ফিসফিস করে বললাম, 'এসব না জানাই ভালো। আমার দিকে ভালো করে তাকা, আর আমার চেহারাটা মনে রাখবি। মনে থাকবে ?'

'জি।'

'আমার নামটাও মনে রাখবি, ঠিক আছে ?'

'জি।'

'এবার বলতো আমার নামটা কী ?'

'স্যার, নাম তো জানি না আপনার।'

'আমার নাম দন্ত্যন। কী নাম ?'

'দ...দ...।'

'দন্ত্যন।'

'জি, দন্ত্যন।'

'আর একটা কথা, এতক্ষণ যা বললাম, তা যেন আর কেউ না জানে।'

'জানব না স্যার।'

'গুড। এবার তোর নামটা বল।'

'মোখলেস।'

'শুধু মোখলেস?'

'না, মোখলেস মিয়া।'

মোখলেস ভাই এখনো হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। সে ঘটনার পর তিনি আমাকে দেখা মাত্রই স্যালুট দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা ভালো লাগত, পরে কেমন যেন একটা অপরাধবোধ কাজ করত। একদিন তার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, 'মোখলেস ভাই, আসেন আমরা সব কিছু ভুলে যাই, আজ থেকে আপনি আমার মোখলেস ভাই, আর আমি আপনার ছোট ভাই।'

মানুষ যে হাসতে হাসতে কাঁদতে পারে, সেটা আমি অনেক দেখেছি। এই প্রথম খুব কাছ থেকে ব্যাপারটা দেখলাম। কী সুন্দর একটা ব্যাপার— একটা মানুষ একই সঙ্গে হাসছে, আবার কাঁদছে! একই সঙ্গে রোদ আর বৃষ্টির মতো! বড় আনন্দের, বড় রহস্যের!

মোখলেস ভাই আমাকে আবার বললেন, 'দন্ত্যন ভাই, বললেন না, কী দেখছেন?'

'এ দরজাটা তো আগে দেখিনি মোখলেস ভাই।'

'জি, কয়েকদিন আগে স্যার মালয়েশিয়া থেকে এনেছেন। আগেরটা বদলিয়ে এটা লাগিয়েছেন। একটা ডাইনিং টেবিলও এনেছেন।'

'দরজাটার দাম কত?'

'জি, আড়াই লাখ টাকা।'

'কত!'

'আড়াই লাখ টাকা।'

'ডাইনিং টেবিলের?'

'তিন লাখ।'

দরজাটার দিকে আমি আবার তাকালাম। আমাদের সবগুলো ঘর বিক্রি করেও এরকম একটা দরজার দাম হবে না। একই মানুষ একই সঙ্গে কাঁদে আর হাসে, প্রকৃতিতে একই সময় রোদ আর বৃষ্টির অবস্থান হয়, ঠিক তেমনি আকাশ ছোঁয়া কিছু মানুষ আর মাটিতে পড়ে থাকা কিছু মানুষও এক সঙ্গে বাস করে এ পৃথিবীতে! চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে আমার। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে মোখলেস ভাইকে বলি, 'বদিউল আঙ্কেল আছেন বাসায় ?'

'জি। বেশ কয়েকদিন ধরে আপনার খোঁজ করছেন।'

বাসার ভেতরের দিকে পা বাড়াতেই মোখলেস ভাই বললেন, 'আপনার সঙ্গে অনেকদিন একসাথে বসে চা খাই না।'

'আমি আছি কয়েকদিন, একদিন খাব।'

'আপনার হাতের অবস্থা কেমন?'

ম্লান হেসে আমি মোখলেস ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাই। মোখলেস ভাই আমার দুটো হাত এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আপনাদের বাড়ি থেকে কেন আপনি মাঝে মাঝে চলে যান, তা তো জানি না। শেষবার যাওয়ার সময় তো আমার সঙ্গে একটু দেখাও করলেন না।'

'প্রতিবার বাড়ি থেকে পালানোর সময় আপনার কাছ থেকে তো বেশ কয়েকবার টাকা নিয়েছি মোখলেস ভাই, এখন লজ্জা লাগে।'

মোখলেস ভাই অবাক হয়ে বলেন, 'আমার কাছে আপনার লজ্জা লাগে! এটা একটা কথা বললেন ?'

আমি এবার মোখলেস ভাইয়ের হাত দুটো চেপে ধরে বলি, 'দেখেন, একদিন আমি অনেক বড়লোক হবো, তখন আমি আপনার সব টাকা ফেরত দিয়ে দেব।'

খুব দুঃখ ভরা গলায় মোখলেস ভাই বলেন, 'আমি কি আপনাকে টাকাগুলো ফেরত নেওয়ার জন্য দিয়েছি!' মাথাটা নিচু করে মোখলেস ভাই মেইন গেটের দিকে চলে যান।

কল বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল অর্পা। রূপময় কোনো মুখ দেখলে প্রায় প্রতিটা পুরুষই অন্তত একটু সময়ের জন্য সব কিছু ভুলে যায়, আমিও ভুলে গেলাম। স্রষ্টা পৃথিবীর সব কিছু সুন্দর করে বানিয়েছেন এটা বলা যাবে না, তবে কিছু কিছু জিনিস খুব বেশি সুন্দর করে বানিয়েছেন। স্রষ্টার এ পক্ষপাতিত্ব আমি কখনো সাপোর্ট করি না, তবে এ মুহূর্তে করি।

'কেমন আছেন আপনি ?' অর্পার চোখের দিকে তাকালাম আমি।

পাথর চোখে তাকিয়ে আছে অর্পা আমার দিকে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। স্থির, অথচ সব কিছু সব দিক দেখে নিচ্ছে চোখ দুটো।

'আমি ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছি!'

গলাটা খাদে নামিয়ে অর্পা বলল, 'আপনার তাই হওয়া উচিত।'

'তাতে লাভ ?'

'অন্তত একটা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।'

'সে তো একটা যন্ত্রণা।'

'তো ?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে অর্পা আমার দিকে তাকায়।

'আমাদের প্রতিটা দিন শুরুই হয় যন্ত্রণা দিয়ে। ঘুম ভেঙে একটা অনিশ্চিত

জীবন শুরু করার যন্ত্রণা, তারপর বেঁচে থাকার যন্ত্রণা। এই বেঁচে থাকতে গিয়ে আমরা প্রতিদিন একবার করে হলেও অপমানের যন্ত্রণা ভোগ করি, একবার করে হলেও মরে যাওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করি, জীবনকে নিজেদের মতো না সাজাতে পারার যন্ত্রণা ভোগ করি, আরো কত যন্ত্রণা! যদিও আপনাদের কথা আলাদা।'

'আমাদের কথা আলাদা কেন ?'

হাসি হাসি মুখ করে আমি অর্পার দিকে তাকাই, 'যে হাত কখনো কোনো কাদা মাটি স্পর্শ করল না, সে হাত কাদা স্পর্শের যন্ত্রণা বুঝবে কী করে; যে পা-কে চলতে হলো না কোনো কঙ্কটময় পথে, পথ চলার যন্ত্রণা বুঝবে কী করে সে পা; যে মুখে কখনো ঘাম জমে না, নোনা ঘামের যন্ত্রণা বুঝবে কি করে সে মুখ ? আপনারা আলাদা, শো কেসে সাজিয়ে রাখা শো পিসের মতো।'

'তার মানে আমাদের কোনো যন্ত্রণা নেই ?'

'আছে, অনেক কিছু পাওয়ার পরও আরো অনেক কিছু পেতে চাওয়ার যন্ত্রণা।'

নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার চেষ্টা করে অর্পা, সেটা আর নিঃশব্দে হয় না। একটা সোফায় বেশ শব্দ করে বসে পড়ে সে। অর্পার মুখটা আগের চেয়ে আরো বেশি লাল দেখাচ্ছে, রাগ আর অপমানিত হওয়ার মতো লাল। আমি ওর দিকে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'বলুন তো ঘাসফুলের রঙ কী ?'

'জানি না।'

'অথচ সে রঙের একটা ড্রেস পড়ে আছেন আপনি।'

নিজের পোশাকের দিকে এক পলক তাকিয়ে অর্পা আমার দিকে তাকাল, 'আপনি নিজেকে কী মনে করেন বলেন তো ?'

'এটা তো কখনো ভাবিনি।'

'এরপর থেকে ভাববেন।'

'আচ্ছা, ভাবব।'

'আর শুনুন, যখন তখন মানুষকে জ্ঞান দিতে যাবেন না।'

'ঠিক আছে দেব না।'

'আর আমার দিকে ওরকম হ্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকবেন না।'

'আমি তো আপনাকে দেখছি না।'

'তাহলে ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন ?'

'আড়াই লাখ টাকা দামের দরজা যাদের ঘরে শোভা পায়, তিন লাখ টাকা দামের ডাইনিং টেবিল যাদের ডাইনিং রুমে, সামান্য কাপড় কিনতে তাদের টাকা কম পড়ে এটা আমার জানা ছিল না।' হাসতে হাসতে আমি চোখ দুটো অন্য দিকে ফিরিয়ে নেই।

'মানে ?'

'মানে আপনার জামার গলাটা বেশ বড় আর জামার হাতাও নেই একেবারেই, ভাবলাম ওটুকু কাপড় কেনার টাকা বোধহয় আপনার নেই।' হাসতে হাসতেই আমি আবার অর্পার দিকে তাকাই।

গলার সঙ্গে পেঁচানো ওড়নাটা টেনে নামিয়ে অর্পা অস্ফুট স্বরে বলে, 'অসভ্য।'

'কে— আমি ?'

'আপনি নাতো কে ?'

'তাই! আচ্ছা বলুন তো মুহূর্ত বানানটা কী ?'

কপাল কুঁচকে অর্পা আমার দিকে তাকাল, 'আপনি আমার মেরিট টেস্ট করছেন নাকি ?'

'বলতে পারেন হ্যাঁ।'

দাঁত দিয়ে চিবানোর মতো করে অর্পা মুহূর্ত বানানটা বলল এবং সঠিকভাবে বলল। আমি বললাম, 'বানান তো ঠিকই বললেন, কিন্তু লিখতে গেলে ভুল করেন কেন ?'

'ভুল করি? কোথায় ভুল করলাম ?'

বিকেলে মিতি আমাকে যে চিঠিটা দিয়েছিল, পকেট থেকে সে চিঠিটা বের করলাম আমি, 'এই চিঠিতে কয়েকটা লাইন আছে এবং সেখানে তিন জায়গায় মুহূর্ত শব্দটা আছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, তিনটা মুহূর্ত বানানই ভুল।'

কিছুটা রাগী গলায় অর্পা বলল, 'চিঠিটা কে লিখেছে ?'

বেশ কিছুক্ষণ অর্পার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, 'আমি জানি না।'

ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই অর্পা বলল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

'আপনার বাবার কাছে।'

'এখন যাওয়া যাবে না।'

'কেন ?'

'অসুবিধা আছে।'

'অসুবিধা ?'

'হ্যাঁ, বাবার ঘরে এ সময়টাতে ঢোকা নিষেধ।'

'কার জন্য নিষেধ ?'

'সবার জন্য।'

'আমার জন্য না। উনি আমাকে বেশ কয়েকবার খুঁজেছেন।'

চিৎকার করার মতো করে অর্পা বলল, 'খুঁজেছেন ভালো কথা, আপনি পরে আসুন।'

অর্পার চিৎকারে বদিউল আঙ্কেল নিজেই বের হয়ে এলেন। সম্পূর্ণ খালি গা, কেবল লুঙ্গি পরা, সে লুঙ্গিটা আবার শরীরের এমন জায়গায় ঝুলে আছে, আর একটু নিচে নামলেই সর্বনাশ। তিনি আমাকে দেখেই চোখ দুটো টেনে ধরার মতো করে বললেন, 'কে, হু আর ইউ ?'

আমি একটু এগিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে আরো ভালো করে দেখে বললেন, 'ও দন্ত্যন! এসো এসো। আমি তোমাকে কতদিন ধরে খুঁজছি, জানো ?'

পেটের ভেতরটা উল্টে আসছে আমার। বদিউল আঙ্কেলের মুখ দিয়ে বকবক করে মদের গন্ধ আসছে। হাত দিয়ে আমি নাকটা চেপে ধরতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মাই ডিয়ার, দিজ ইজ কলড লাইফ। এসো এসো, আমার ঘরে এসো, তোমার সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরি কথা আছে।'

বদিউল আঙ্কেল আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে তার ঘরে ঢোকালেন। ঠিক ঘরে ঢোকার আগে আমি মুখটা ঘুরিয়ে অর্পার দিকে তাকালাম, অর্পার চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। সে আগুনকে পাত্তা না দিয়ে মুচকি একটা হাসি দিলাম আমি।

এ ঘরে আমি এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি, কিন্তু এবার এসে আমি চোখ দুটো বড় বড় করে ফেললাম। ঘরের চারপাশে কোনো দেয়াল দেখা যাচ্ছে না, সে দেয়ালের সঙ্গে লাগালো কাচের শো কেসের মতো জায়গাগুলোতে শুধু বোতল আর বোতল। বোতলগুলো সব বিভিন্ন রঙের পানির মতো জিনিসে ভরা। ঘরের মাঝখনে কয়েকটা সোফাসেট বিছানো, তার সামনে একটা শ্বেতপাথরের মতো সাদা গোল টেবিল। আঙ্কেল সে টেবিলের সামনে বসতে বসতে আমাকে বললেন, 'ওভাবে কী দেখছ, মাই ডিয়ার ? দিজ ইজ কলড লাইফ। বসো বসো।'

কোনার দিকে একটা সোফায় বসার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্কেল একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্লিজ, টেক ইট এন্ড ডিংঙ্ক ইট।'

খুব স্বাভাবিকভাবে গ্লাসটা হাতে নিলাম আমি। এভাবে নেওয়াটার একটা কারণ আছে। বদিউল আঙ্কেল প্রথম বার যখন আমাকে তার ঘরে নিয়ে আসেন সেদিনও তিনি আমাকে এরকম একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক বলার পরও আমি সেটা হাতে নেইনি। শেষে আঙ্কেল গ্লাসটা ছুড়ে মারলেন দেয়ালে, তারপর আঙ্কেলের সে কী চিৎকার! ঘটনাটা শোনার পর মোখলেস ভাই আমাকে একটা বুদ্ধি দিয়েছিলেন। মাতাল অবস্থায় কোনো লোক কোনো কিছু দিলে সেটা নাকি নিতে হয়, কোনো অবস্থাতেই না করা উচিত না, তাতে তারা রেগে যায়। তারপর থেকে আমি আর কখনোই আঙ্কেলের বাড়িয়ে দেওয়া হাত ফিরিয়ে দেই না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে— গ্লাসটা হাতে নেওয়ার পর সেটা নিয়ে কী করা হলো আঙ্কেল সেটা মোটেই খেয়াল করেন না। তিনি গ্লাসে ভরে যা আমার হাতে দেন, একটু পর আমি তা রেখে দেই টেবিলে।

'শোনো।' বলেই আঙ্কেল গ্লাসে একটা চুমুক দেন। 'তোমার জন্য আমি একটা কাজ ঠিক করেছি। যেহেতু তুমি পড়াশোনাটা বন্ধ করে দিয়েছ, তাই ভাবলাম তোমাকে দিয়ে কাজটা করানো যায়। তুমি কি কিছু গেস করতে পারছো আমি তোমাকে কী কাজ দেব ?'

'না আঙ্কেল।'

'তুমি কল্পনাই করতে পারবে না তোমার জন্য কাজটা কত ইনজয়যেবল। কি বুঝতে পারছ ?'

'না আঙ্কেল।'

'জীবনে এরকম সুযোগ মাত্র একবারই আসে, কারো কারো জীবনে আবার একবারও আসে না। কি এবার বুঝতে পারছ ?'

'না আঙ্কেল।'

'কি আঙ্কেল আঙ্কেল করছ, আমার কি ভাই হওয়ার মতো বয়স চলে গেছে না কী ?' আঙ্কেল একটা হেচকি দিয়ে বোতল থেকে আবার গ্লাসে ঢালতে থাকেন। ঢালতে ঢালতে তিনি বলেন, 'এখন থেকে তুমি আমাকে ভাই বলে ডাকবে, ঠিক আছে?'

আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে বললাম, 'তা ঠিক আছে, কিন্তু অর্পা আর অর্ণা তাহলে আমাকে কী বলে ডাকবে ?'

'কেন, আঙ্কেল বলে ডাকবে।'

'আমার কি আঙ্কেল হওয়ার বয়স হয়েছে ?'

বদিউল আঙ্কেল আমার দিকে ভালো করে তাকালেন। গ্লাসে চুমক দিতে দিতে বেশ কিছুক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমাকে যা বলছিলাম, তুমি কি কাজটা করতে রাজি ?'

'কাজটা কী, আমি জানতে পারি ?'

'সিওর। তার আগে বলো, তুমি এ কথাটা আপাতত আর কাউকে বলবে না।'

'জি বলব না।'

গ্লাসে আরেকবার চুমুক দিয়ে আঙ্কেল বললেন, 'তুমি এ কাজটার জন্য প্রতিমাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে।'

'জি!'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ পঞ্চাশ হাজার দ্যাটস মিন ফিফটি থাউজেন্ড।'

বুকের ভেতরে কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে আমার, 'পঞ্চাশ হাজার! এত টাকা দিয়ে আমি কী করব ?'

'এত টাকা! এত টাকা তুমি কই দেখলে দন্ত্যন ? এখন তোমার কাছে এটা অনেক বেশি টাকা মনে হচ্ছে, এটা পেতে পেতে এক সময় তোমার মনে হবে এটা খুব সামান্য টাকা। যাক গে, টাকার অঙ্কটা তোমার পছন্দ হয়েছে ?'

'কিন্তু কাজটা কী আঙ্কেল ?'

'লন্ডনে আমার একটা বাড়ি আছে। আমি ভাবছি ওখানে অর্পা আর অর্ণাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু মুশকিল হলো ওদের সঙ্গে আমি থাকতে পারব না, তুমি তো জানো ওদের মা-টা হঠাৎ করে মারা গেল আর বাংলাদেশেও আমার অনেক ব্যবসা। এ ব্যবসা ছেড়ে আমার লন্ডনে থাকা একদম সম্ভব না। তাই ওদের গার্ডিয়ান হিসেবে তুমি যাবে ওদের সঙ্গে এবং থাকবেও ওদের সঙ্গে। থাকা-খাওয়ার সব কিছুই আমি দেব, তুমি শুধু ওদের একটু দেখে রাখবে, আর মাস শেষ হলেই পেয়ে যাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। তুমি যদি মনে করো আরো একটু বেশি দরকার, তা তুমি বলতে পারো।'

'না, আর বেশি দরকার নেই আমার।'

'গুড।' আঙ্কেল উঠে দাঁড়িয়েছেন, আমিও উঠে দাঁড়ালাম। হাতের গ্লাসটা ভর্তি আঙ্কেলের, তিনি এগিয়ে আসছেন আমার দিকে । কিন্তু একটু এগুতেই তিনি একটা সোফার সঙ্গে গুতো খেলেন। গ্লাসটা পড়ে গেল মেঝেতে, কিন্তু কার্পেটের ওপর পড়ায় ভেঙে গেল না সেটা, তবে তার ভেতর যা ছিল সব পড়ে গিয়ে ভিজে গেল কার্পেটটা। কী আশ্চর্য! আঙ্কেল সেই ভেজা কার্পেটের ওপর ধপাস করে শুয়ে পড়লেন।

আঙ্কেল চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন কার্পেটের ওপর, কিন্তু লুঙ্গিটা কোমড় থেকে খুলে গিয়ে তারই মতো স্থির হয়ে পড়ে আছে তার পায়ের কাছে।

আজ রাতে আমরা কিছু খাব না। সপ্তাহে তিন রাত আমরা এরকম খাই না। বারান্দায় বসে এদিন আমরা অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি, বেশির ভাগই বাবার শৈশবের গল্প। গল্প বলতে বলতে বাবার চোখে পানি এসে যায়। সেদিন জ্যোৎস্নাভেজা রাত হলে আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি বাবার দিকে, মুক্তো দানার মতো বাবার চোখের ফোঁটাগুলো কী রকম এক অভিজাত মনে হয়, মুগ্ধ হয়ে সে আভিজাত্য দেখি। একসময় বাবার গল্প থেমে যায়, আমরা তখন আমাদের ছোট্ট বারান্দায় আমাদের নিজেদের ছায়ার মাঝে নিজেদের খুঁজি, চুপচাপ, অনেকক্ষণ।

কোনো কোনো দিন বাবা গল্প শুরুর আগেই আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলেন, 'কেমন আছো তোমরা ?'

আমরা কেউই এ প্রশ্নের উত্তর দেই না। কেবল নিজেই নিজেকে আবার প্রশ্ন করি— কেমন আছি ? উত্তর মেলে না। বড় কঠিন আর অমীমাংসিত প্রশ্ন যে।

কোনো কোনো দিন বাবা গল্পটা শুরু করেন এভাবে— 'জানিস, আমার না একটা বন্ধু ছিল—।'

বাবার কথাটা শেষ করার আগেই মিতি বলে, 'কোন বন্ধু বাবা ? ওই যে তোমাদের ক্লাসের সবচেয়ে খারাপ ছাত্র ছিল যে, তিনি ? যিনি এখন কোন মন্ত্রণালয়ের যেন মন্ত্রী ? যার ঢাকায় এখন পাঁচ-ছয়টা বাড়ি হয়েছে, কয়েকটা গাড়ি হয়েছে, ব্যাংক ব্যালান্স বেড়েছে কয়েক কোটি টাকার। যিনি মাঝে মাঝে তোমাকে ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে হোটেল শেরাটনে খাওয়ায় ?'

'না, ও না।'

'তাহলে তোমার সেই বন্ধু—।' মনু আপা বাবার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'ওই যে, কী একটা পরীক্ষা দেওয়ার সময় তুমি নিজে না লিখে তোমার সেই বন্ধুকে সাহায্য করেছিলে, তারপর তোমার সেই বন্ধুটা কাস্টমের বিরাট একটা চাকরি পেয়ে গেল ? যার দু ছেলেমেয়ে এখন লন্ডনে লেখাপড়া করে। কোনো কোনো ছুটির দিন আমাদের বাড়িতে এসে যিনি তোমাকে জাপটে ধরে কাঁদেন ?'

'না, ও না।'

'তাহলে নিশ্চয় তোমার সেই বন্ধু, যাকে তুমি নিজে না খেয়ে অনেকদিন খাইয়েছ।' আমি বাবার দিকে ঝুঁকে এসে বলি, 'যিনি এখন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, যার শরীরের ওজন ছিল বাষট্টি কেজি, এখন একশ দশ কেজি ? ডাক্তারের পরামর্শে যিনি আর এখন তেমন কিছু খেতে পারেন না, শুধু পানি খেয়েই তার দিন কাটে ? কিন্তু কোনো কিছু খেতে না পারলেও সাভারে কয়েকশ' বিঘার জমির মালিক হয়েছেন তিনি, শীতের দিনে যিনি আমাদের জন্য কিছু ধান পাঠান পিঠা তৈরি করে খাওয়ার জন্য ?'

'না, সেও না।'

বাবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে আমি বলি, 'তাহলে ?'

বাবা আর কোনো কথা বলেন না। কেবল মাথাটা নিচু করে কী যেন ভাবেন। কিছুক্ষণ পর শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আমাদের বাসার পুরনো টিনের গেটটার দিতে তাকান, গেটের পাশে লাগানো কামিনী ফুলের গন্ধ আসছে সেখান থেকে। সে সময়টা খুব নিঃশব্দ মনে হয়।

এক সময় নিঃশব্দটা খুব বেশি হয়ে যায়, এত বেশি হয়ে যায়, আমাদের টিনের চালে টিপ টিপ করে ঝরে পড়া শিশিরের শব্দ শুনতে পাই আমরা।

বাবার আসলে তেমন কোনো বন্ধু নেই। পুরনো নড়বড়ে কাঠের চেয়ার, এখানে ওখানে ভেঙে যাওয়া টেবিল আর সে টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ থাকা চাকুরীজীবিদের তেমন কোনো বন্ধু থাকে না। কোনো এক কালে তার সঙ্গে পরিচয় থাকা কিংবা এক সঙ্গে লেখাপড়া করা কেউ যদি পরবর্তীকালে নামি দামি কেউ হন, তাদের পরিচয় দিতে এক ধরনের সুখ লাগে বলেই এত ঘটা করে বলা— অমুক আমার বন্ধু।

বাবা একদিন হাসতে হাসতে বলেন, 'কলেজে পড়ার সময় একটা মেয়েকে আমার খুব ভালো লেগেছিল।'

বাবা এই কথাটা বলতেই মা কেমন যেন কুঁচকে যায়, মাথার ঘোমটাটা আরো একটু টেনে ধরে, অযথা খুকখুক করে কাশে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা অসম্ভব মনোযোগী হয়ে উঠি বাবার দিকে। কিন্তু বাবা ওটুকু বলেই থেমে যান। মনু আপা তখন খুব আগ্রহ নিয়ে বলে, 'বাবা, তারপর?'

হাসি হাসি মুখ করে বাবা মনু আপার দিকে তাকান, 'তারপর ? তারপর আর কিছু নেই।'

'কিছু নেই!' বাবার দিকে তাকিয়ে বাবার মতোই হাসতে হাসতে আমি বলি, 'তারপর তুমি কবিতা লেখোনি ?'

'হ্যাঁ, লিখেছি দু'একটা।'

'দু'একটা না বাবা, অনেকগুলো। সেই কবিতা লিখতে লিখতে কখনো কখনো তুমি উদাস হয়ে যেতে, মাঝে মাঝে কিচ্ছু ভালো লাগত না তোমার, এমনকি ঘুমও আসত না।'

'তুই কী করে জানিস ?'

'বারে, এসব আবার জানতে হয় নাকি!'

'জানিস, একদিন কলেজের মাঠে বসেছিলাম, একা একা। মেয়েটা হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, খুব জরুরি কথা। কিছুক্ষণ থেমে থাকে মেয়েটি, আর কিছু বলে না। আমি উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছি তার দিকে, সে বলেই না। বেশ কিছুক্ষণ পর কিছুটা হাসতে হাসতে বলে, থাক, আজ বলব না। অন্যদিন বলব।'

'তোমার সারাদিন সেদিন আনন্দে কেটেছে, যেদিকে তাকিয়েছ সবকিছু সুন্দর লেগেছে তোমার, সবার সঙ্গেই তুমি সেদিন হেসে হেসে কথা বলেছ এবং যথারীতি সে রাতেও তোমার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি।'

বাবা হাসতে থাকেন।

মনু আপা আবার বলে, 'বাবা, তারপর ?'

'তারপর—।' রহস্যময় মুখ করে বাবা মনু আপার দিকে তাকান, 'তারপর ভয়ঙ্কর এক দুঃসংবাদ।'

'দুঃসংবাদ!'

'হ্যাঁ, দুঃসংবাদ। তার কয়েকদিন পর মেয়েটা ছোট্ট একটা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বলে, আমার মেয়ে। তারপর আমাকে দেখিয়ে মেয়েটাকে বলে, এটা তোমার আঙ্কেল হয়, সালাম দাও।'

'মেয়েটা বিবাহিত ছিল!' প্রচণ্ড অবাক হয়ে মনু আপা বলে।

বাবা আবার হাসতে থাকেন।

থপ থপ শব্দ করে মিতি ঘরে ঢোকে। আমার একেবারে কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলে, 'কিরে, তুই ইদানীং কানে কম শুনিস নাকি?'

'কেন ?'

'মা তোকে কখন থেকে ডাকছে শুনতে পাস না?'

'না, শুনতে পাইনি।'

'মা তোকে খেতে ডাকে।'

'কেন ? আজ তো আমাদের খাওয়ার কথা না।'

'আমরা আজ খাব না, কিন্তু তুই খাবি।'

'আমি একা খাব কেন ?'

মিতি হাসতে হাসতে বলে, 'বাড়ির একমাত্র ছেলে, সে আবার অনেকদিন পর বাড়ি এসেছে, আর কেউ না খাক, তাকে তো অন্তত খাবার দিতে হবে, না কি ?'

'না দিলে কী হয় ?'

'কিছুই হয় না। কেবল আমাদের পৌরাণিক ধরনের মায়েরা বুকের ভেতর ব্যথা অনুভব করেন, তারা নীরবে কেঁদে নির্ঘুম কাটান সারারাত, নিজের সন্তানের জন্য বিসর্জন দিয়ে দেন সব সুখ।'

'আচ্ছা, এই যে আমরা তিন রাত না খেয়ে থাকি, তাতে আমাদের সংসারে কত টাকা বাঁচে বল তো ?'

'কত টাকা বাঁচে জানি না। তুই কলেজে ওঠার পরই তো হঠাৎ করে খরচটা বেড়ে যায় আমাদের, সে খরচ জোগাতেই আপা আর আমি মিলে রাতের খাবারটা বন্ধ করি। এতে বাবার সে কী আপত্তি! তারপরেও আমরা বাবার কথা শুনিনি। নিজের সন্তানদের তিন রাত না খাইয়ে রাখবেন তিনি, এ কথা ভাবতেই এক রাতে বাবার সে কী কান্না! সেই তুইও পরীক্ষাটা দিলি না। তারপর আমি উঠলাম কলেজে, তারপর পরীক্ষা দিলাম, ভালো কোনো জায়গায় ভর্তি হওয়ার জন্য এখন কোচিং করছি, এ সবকিছু করতেই টাকা লাগেরে।' আমার মুখের দিকে মিতি তাকায়, 'আচ্ছা, ঘরে ঢোকার সময় দেখলাম তুই হাসছিলি, কেন ?'

'একটা মেয়েকে বাবার ভালো লেগেছিল, তোর মনে আছে ?'

'তোর হঠাৎ এ কথাটা মনে পড়েছে, না ?'

'আমাদের বাবাটা সেই প্রাচীন বাবাই রয়ে গেলেন। সারাজীবন দাসত্ব আর আটপৌরে কাটিয়ে দিলেন নিজেকে। কখনো ভালো ছিলেন না, ভালো থাকবেনও না।'

'কে বলল ভালো থাকবেন না ? তুই কি মনে করিস তুই লেখাপড়া বাদ দিয়েছিস, তুই কিছু করতে পারবি না বলে বাবা ভালো থাকবেন না ? দেখিস, আমাদের ডান পাশের বদিউল আঙ্কেলের মতো চার তলা না হোক বাম পাশের আজমল আঙ্কেলের মতো দোতলা একটা বাড়ি হবে আমাদের। দোতলায় একটা বড় রুম হবে, সেটা হবে কেবল বাবার একার। সে ঘরে অনেকগুলো জানালা হবে, বাবা তার সবগুলো জানালা খুলে দেবেন। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ যেদিক থেকেই বাতাস আসুক না কেন বিশুদ্ধ বাতাসে ভরে যাবে বাবার ঘরের সবটুকু। প্রতিদিন রাতে আমরা সে ঘরে বসে আড্ডা দেব, গল্প করব। বাবা গল্প বলতে বলতে কখনো উদাস হয়ে যাবেন, আমরা তখন হঠাৎ বাবার দিকে সবচেয়ে দামি একটা সিগারেটের প্যাকেট আর চমৎকার একটা লাইটার এগিয়ে দেব, বাবা অবাক হয়ে যাবেন। তারপর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দু'টুকরো করতে নিতেই বাধা দেব আমরা। সম্পূর্ণ সিগারেটটায় বাবাকে আগুন ধরাতে বলব। বাবা সিগারেটটা ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আয়েশী এক ভঙ্গি করে আবার গল্প বলা শুরু করবেন। আমরা আবার মুগ্ধ হয়ে যাব।'

'বাবা একটা সিগারেট দু'টুকরো করে খেতেন তোর মনে আছে ?'

'বাবা সিগারেট খেতে খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু সিগারেট খাওয়ার পরপরই বেশ অপরাধবোধে ভুগতেন তিনি। খরচ একটু কম হবে বলে তিনি একটা

সিগারেটকে দু'টুকরো করে এক টুকরো রেখে দিতেন, আরেক টুকরা খেতেন। বাবাকে এই সময়টাতে অসম্ভব সুখী মনে হতো। সংসারের জন্য বাবা তার এই একমাত্র সুখটাও বাদ দিয়ে দিয়েছেন।' মিতি চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'আজমল আঙ্কেল আর আন্টি খুঁজছিলেন তোকে।'

'কেন ?'

'কেন তুই জানিস না ?'

'আমাকে তো অনেকেই পছন্দ করে।'

'তা তো জানি।' মিতি জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে দুষ্টু দুষ্টু হেসে বলে, 'তাই তো কাউকে কাউকে জানালায় উঁকিঝুকি মারতে দেখি।'

'তাই, না? তুই ইদানীং একটু বেশি বুঝিস মনে হচ্ছে ?'

'বেশি বুঝব না, হু হু।' মিতি অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাঁধ দুটো একটু উঁচু করে বলে, 'ক'দিন পর ভালো একটা জায়গায় ভর্তি হবো, সে কথা তোর মনে আছে ?'

পূর্ণ চোখে আমি মিতির দিকে তাকাই, আপনা আপনি আমার চোখে পানি এসে যায়। আমি ওর একটা হাতে ধরে বলি, 'বল তো, ভালো কোনো জায়গায় ভর্তি হতে পারলে তোকে আমি কী দেব ?'

'কিছু দিতে হবে না ভাইয়া, আমাদের তো রিকশায় করে কোথাও যাওয়া হবে না, ভালো কোথাও ভর্তি হতে পারলে তুই আমাকে মাঝে মাঝে সেখানে পৌঁছে দিস, আমরা সারা রাস্তা হেঁটে হেঁটে যাব আর আমাদের স্বপ্নের কথা বলব।' মিতি আমার হাত টানতে টানতে বলে, 'চল তো, মা তোর জন্য খাবার নিয়ে বসে আছে। তাছাড়া আজ আমাদের গল্পবার না ? আজ অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করব আমরা। জানিস, বাবা নাকি আজ আমাদের কী একটা বলবেন, একটা আনন্দের কথা নাকি বলবেন।'

বাবা বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমরা কি বুঝতে পারছ আমি আজ তোমাদের কী বলব ?'

বারান্দায় একটা মাদুর পেতে গোল হয়ে বসে আছি আমরা। বাবা বসে আছেন একটা ছোট্ট কাঠের টুলে। আমরা বাবার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পরস্পর নিজেদের দিকে তাকালাম। সবাই সবাইকে চোখ দিয়ে ইশারা করলাম, কিন্তু কেউ কাউকে কোনো কিছু বুঝাতে পারলাম না, বাবা আসলে কী বলবেন।

আমাদের দিকে তাকিয়ে বাবা মুচকি মুচকি হাসছেন। এভাবে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'তোমরা পারছো না, না ?'

মনু আপা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'না।'

'আরো একটু ভাবো।'

'এত ভাবতে টাবতে পারব না তো বাবা, প্লিজ একটু জলদি বলো, উত্তেজনায় প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাদের একটা ক্লু দিচ্ছি— সেদিন একটা বিশেষ দিন।'

'বিশেষ দিন ? বিশেষ দিনটা কার ?' বাবার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকায় মিতি।

'আমাদের সকলেরই।'

লুবা খুক করে কেশে কিছুটা শংকিত গলায় বলল, 'বাবা, আমরা কি সেদিন আনন্দ করব?'

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা সেদিন আনন্দ করব, অনেক আনন্দ করব।'

'সেদিন কি আমরা নতুন জামা পরব ?'

'হ্যাঁ, সেদিন আমরা নতুন জামাও পরব।'

'বাবা—।' কথাটা শেষ করল না লুবা। মাথা নিচু করে হাতের আঙুল দিয়ে কী যেন আঁকতে লাগল মেঝেতে।

বাবা একটু এগিয়ে বসে লুবার থুতনির নিচে মাথাটা উঁচু করে বললেন, 'তোর কোনো নতুন জামা নেই, না ?'

মাথা উঁচু নিচু করে আবার মেঝের দিকে তাকাল লুবা।

শব্দ করে হেসে উঠলেন বাবা। তারপর লুবাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ঠিক আছে, সেদিন তোকে একটা নতুন জামাও কিনে দেব আমি।'

পাশ থেকে বাবার দিকে একটু ঝুঁকে বসে মিতি বলল, 'আমাকে ?'

'তোকেও একটা দেব।' বাবা মিতি থেকে চোখ সরিয়ে মনু আপার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর তোকে কিনে দেব—।' কথাটা শেষ না করে বাবা আপার দিকে একটু গভীরভাবে তাকিয়ে বললেন, 'বল তো মা, তোকে কী কিনে দেব আমি ?'

আপা ওর শাড়ীর আঁচলটা আরো একটু সামনে টেনে এনে বলল, 'আমার কিছু লাগবে না বাবা।'

'কে বলল লাগবে না ?' বাবা কপট রাগে আপার দিকে তাকালেন। একটু পর হাসতে হাসতে বললেন, 'তোকে সেদিন একটা শাড়ি কিনে দেব।'

'আমার কিছুই লাগবে না বাবা। তুমি বরং মাকে একটা শাড়ি কিনে দিও।'

বাবা বেশ অভিমানী গলায় বললেন, 'তোর কি মনে হয়. তোর মাকে সেদিন কিছু দেব না আমি।'

'আমি সে রকম কিছু মনে করিনি বাবা।' আপা একটু এগিয়ে বসে বাবার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'সত্যি সত্যি আমার কিছু লাগবে না বাবা। গত ঈদে আমাকে যে শাড়িটা কিনে দিয়েছিলে, সেটা তো এখনো পরা হয়নি। আমি না হয় সেটাই পরব। তার চেয়ে দন্ত্যনকে একটা শার্ট কিনে দিও তুমি, ওর একটা ভালো শার্টও নেই।'

'ওকে তো একটা কিছু দেবই।' বাবা আমার দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকালেন, 'ও তো আমার বন্ধু।'

মিতি সঙ্গে সঙ্গে অভিমান আর প্রতিবাদ মিশ্রিত গলায় বলল, 'আমরা তোমার বন্ধু না?'

'তোরাও আমার বন্ধু।'

'মা?'

বাবা আগের চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোর কী মনে হয়?'

মাকে জড়িয়ে ধরে মিতি বলল, 'মা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।'

দুষ্টু দুষ্টু চোখে বাবা মায়ের দিকে তাকাতেই গম্ভীর মুখে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল মা।

সপ্তাহে তিন রাত যে আমরা না খেয়ে থাকি তার একটা রাতে আমরা একটা মিটিংয়ের মতো করি, আর সে রাতটা হলো বৃহস্পতিবারের রাত। কোনো কারণ থাকুক অথবা না থাকুক বাবা এ রাতটাতে আমাদের সবাইকে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন। এটা ওটা নিয়ে আলোচনা করেন, পরামর্শ করেন, শেষে কোনো কিছু না থাকলে অন্য দু'রাতের মতো গল্প করেন। অন্য দু'রাত আমরা না খেয়ে থাকলেও এ রাতটাতে মা তার জীবনের সেরা যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে রং চা বানিয়ে দেয় আমাদের, সঙ্গে কিছু মুড়ি কিংবা নরম হয়ে যাওয়া দু'একটা বিস্কুট। আমরা প্রত্যেকে সে চা এভাবে খাই যে, কাপের সঙ্গে এক ফোটা চা-ও আর অবশিষ্ট থাকে না। এক ফোটা চা থাকা মানে মায়ের এক ফোঁটা ভালোবাসা মিস— আমরা কেউই আমাদের মায়ের এক ফোঁটা ভালোবাসা হারাতে চাই না।

এক বৃহস্পতিবার রাতে বাবা বেশ জরুরি ভিত্তিতে আমাদের সবাইকে ডাকলেন। আমরা সবাই এক সঙ্গে উপস্থিত হওয়ার পর বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, 'ভীষণ একটা সমস্যায় পড়েছি আমি, তোমরা আমাকে বুদ্ধি দাও এবং উদ্ধার করো।'

মনু আপা বলল, 'সমস্যাটা কী বাবা?'

কিছুটা ইতস্তত করে বাবা বললেন, 'বলতে লজ্জা লাগছে রে।'

মিতি বাবার দিকে বেশি ঝুঁকে এসে বলল, 'ব্যাপারটা কি খুবই লজ্জার?'

'খুবই।'

'কেউ কি তোমার কাছে টাকা ধার চেয়েছে বাবা, যা তুমি দিতে পারবে না?' আপাও ঝুঁকে এলো বাবার দিকে, 'সেটা নিয়ে কি তোমার লজ্জা লাগছে বাবা?'

'না।'

'কোনো কারণে কাউকে কি মিথ্যা বলতে হবে তোমাকে বাবা?' মিতি বাবার চোখের দিকে তাকায়।

বাবা আগের মতোই ছোট্ট করে বলেন, 'না।'

খুক করে একটু কেশে নিয়ে আমি বাবাকে বললাম, 'তোমার সমস্যাটা বোধহয় আমি বুঝতে পেরেছি বাবা।'

বাবা কিছুটা ভীত চোখে আমার দিকে তাকালেন, 'কী ?'

'কোনো মেয়ে বোধহয় তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে, ভালোবাসার চিঠি ?'

মা সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা রেগে গিয়ে বলল, 'অ্যাঁ, মেয়েদের আর কাজ নেই, ওনাকে চিঠি দেবে!'

বাবা মুচকি হেসে মায়ের দিকে বিশেষ ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কি মনে হয় আমাকে কেউ চিঠি দিতে পারে না ?'

মা গজগজ করে বলল, 'আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখেন তো ইদানীং ?'

খুব নির্ভার ভঙ্গিতে বাবা বললেন, 'দেখি এবং প্রতিবারই মুগ্ধ হই। বাবা আমাদের সবার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তোদের কি মনে হয় কোনো মেয়ে আমাকে চিঠি দিতে পারে না ?'

'আলবত পারে।' মাটির ওপর মাদুরে একটা ঠাস করে থাপ্পড় মেরে মিতি বলল, 'তোমার মতো হ্যান্ডসাম বাবা আমি কম দেখেছি বাবা। তুমি মাঝে মাঝে আমাকে কলেজে পৌঁছে দিতে না, আমার বান্ধবীরা তোমাকে দেখে তখন কী বলত জানো ?'

বাবা খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'কী ?'

মিতি কিছু বলার আগেই মা ধমকে উঠে বলল, 'চুপ!'

বাবা বেশ কাতর গলায় বললেন, 'আহ্, বলতে দাও না।'

'না, ওসব ঢংয়ের কথা শুনতে হবে না।'

মায়ের দিকে তাকিয়ে আমি হাসি হাসি মুখ করে বললাম, 'মা, বাবা কিন্তু এখনো বেশ ইয়াং।'

'থাক আর বলতে হবে না, শেষে আরেকটা বিয়ে করতে চাইবে।' মা কিছুটা রাগী স্বরে বলে।

'তাতে অসুবিধা কী ?'

মিতি বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাতে অসুবিধা কী ? আরেকটা বিয়ে করলে আমরা বরং বাবার বিয়ে খেতে পারব। তুমি কী বলো বাবা ?'

'বড়ই উত্তম প্রস্তাব, শুনতে বেশ ভালো লাগছে।'

'আমাদেরও ভালো লাগছে বাবা। বাবার বিয়ে খাওয়ার ভাগ্য ক'জন ছেলে মেয়ের হয়?'

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বাবা বলেন, 'ঠিক ঠিক।'

আমি মিতির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বাবার বিয়েতে আমরা একটা কার্ড ছাপাব। বিশ্বের কোথাও কোনো ছেলেমেয়ে বোধহয় তাদের বাবার বিয়ের কার্ড

ছাপায়নি, সেদিক থেকে আমরা হব প্রথম। তাতে গ্রিনেজ বুকে আমাদের নামও উঠে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, সেটা একটা চান্স বটে। আচ্ছা, বাবার বিয়ের কার্ডে আমরা কী লিখব ?' মিতি আগ্রহের চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি একটু ভেবে বললাম, 'সম্মানীয় মুরব্বীয়ান, আগামী অমুক তারিখে আমাদের একমাত্র বাবা শ্রদ্ধেয় লিয়াকত হোসেনের বিয়ে। আপনারা সবান্ধবে এসে দোয়া করে যাবেন। বিনীত মনু, দন্ত্যন, মিতি, লুবা— বরের ছেলে এবং মেয়েরা। ' মিতির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'কেমন হবে রে ?'

'খুবই ভালো।' মিতি কিছুটা লাফিয়ে ওঠার মতো করে বলল, 'কার্ডটা কোন রঙের হবে ভাইয়া ?'

মায়ের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'মা, তুমি বলো তো কার্ডটা কোন কালারের হলে ভালো হয় ?'

প্রচণ্ড রেগে গেছে মা। কিন্তু খুব শান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোদের লজ্জা করে না ?'

আমি কিছু বলার আগেই মিতি বলল, 'লজ্জা কেন ?'

মা আগের মতোই শান্ত ভাবে বলল, 'বাবাকে নিয়ে কেউ এভাবে কথা বলে, কোথাও শুনেছিস এসব ?'

মিতি ওর জায়গা থেকে উঠে গিয়ে মায়ের পাশে বসে বলল, 'কোনো বাবা যে এত বড় একটা বন্ধু হতে পারে, কোথাও দেখেছ তুমি ?'

মা ম্লান মুখে বলে, 'তারপরও।'

মায়ের দিকে তাকিয়ে আমি খুব স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'ঠিক আছে মা, বাবাকে নিয়ে আর এ ধরনের কথা বলব না। পাশের বাসার আজমল আঙ্কেলকে নিয়ে বলব। মা, আজমল আঙ্কেল আরেকটা বিয়ে করবেন কিনা তা তাকে বলে আসি ?'

মা নির্ভার চোখে আমার দিকে তাকায়, যেন আমার কথা বুঝতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী হয়ে গেলাম আমি। অলৌকিক একটা ব্যাপার হচ্ছে-মা, কখনো আমাদের ওপর রাগেন না। এতগুলো বছর কেটে গেল আমার মনে পড়ে না, মা কখনো আমাদের ওপর রেগেছে। আমি অনেকদিন মাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি ব্যাপারটা, কিন্তু করা হয়নি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিল আপা। হঠাৎ পরিবেশটা নিশ্চুপ হতেই আপা বলল, 'তুমি একটা সমস্যার কথা বলছিলে বাবা।'

বাবা একটু সোজা হয়ে বসলেন, 'কাল আমাদের অফিসে একটা লোক আসবে। তাকে একটা কাজ করে দিতে হবে, বিনিময়ে তিনি আমাকে কিছু টাকা দেবেন।'

'কী বললেন!' মা হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে, 'আপনি ঘুষ খাবেন ?'

বাবা বেশ সংকুচিত হয়ে বললেন, 'আমি কি তাই বলেছি ?'

'তাহলে এ কথা বললেন কেন ?'

'আহ্, এ জন্যই তো তোমাদের পরামর্শ চাচ্ছি।'

লুবা হঠাৎ বাবার পাশে গিয়ে বলল, 'লোকটা কত টাকা দিতে চেয়েছে বাবা ?'

'অনেক টাকা।'

'অনেক টাকা কত টাকা বাবা ?' লুবা বদিউল আঙ্কেলের চারতলা বাসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে টাকা দিয়ে কি আমরা এত বড় একটা বিল্ডিং বানাতে পারব?'

'না, তা পারব না।'

লুবা এবার আজমল আঙ্কেলের দোতালা বিল্ডিংযের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে এ রকম ?'

'না, এ রকমও হবে না।'

'একটা ফ্রিজ কেনা যাবে বাবা ?'

'তা যাবে।'

'তাহলে টাকাগুলো নিয়ে নাও বাবা। ইদানীং এত গরম পড়ে, তখন খুব ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছে করে।'

অদ্ভুতভাবে বাবার চোখ দুটো টলটল করে হঠাৎ। লুবাকে জড়িয়ে থরে কাঁপা কাঁপা গলায় কী যেন বলতে চান, বলতে পারেন না। মা দ্রুত উঠে গিয়ে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে কেমন যেন হয়ে যায়। মা বুঝতে পারে না এ মুহূর্তে তার কী করা উচিত। একটু পর বাবার মাথার চুলগুলো টানতে টানতে নীরবে কাঁদতে থাকে মা।

আপা হঠাৎ শব্দ করে লুবাকে ডাকে, 'লুবা ?'

লুবা কিছুটা চমকে উঠে বলে, 'বড় আপু ?'

'এদিকে আয়।'

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আপা বলল, 'বল তো এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানির স্বাদ বেশি, না এক কাপ আইসক্রিমের স্বাদ বেশি ?'

'আইসক্রিমের স্বাদ বেশি।'

'গুড, এই তো বুদ্ধিমতী মেয়ের মতো কথা বলেছিস।' আপা বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, স্কুল থেকে যে বেতন পেয়েছিলাম, তার কিছু টাকা এখনো রয়ে গেছে। ঝটপট শার্টটা পরে নাও তো, আজ সবাই মিলে বড় রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে আইসক্রিম খাব। মা, তোমার শাড়িটাও একটু বদলে আসো তো।'

লুবা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমি কিন্তু দুটো আইসক্রিম খাব আপা।'

ছলছল চোখে আপা হাসতে হাসতে বলল, 'না, তোকে আজ তিনটা আইসক্রিম কিনে দেব।'

বাবা সে লোকটার কাছ থেকে টাকাটা নেননি, কিন্তু কাজটা করে দিয়েছিলেন। আমরা জানি বাবা সে টাকাটা কোনোমতেই নিতেন না, কেবল আমাদের সবার মনোভাব বুঝতে চেয়েছিলেন। আমরা কি বাবাকে সে টাকাটা নিতে বলতাম ? কখনোই না, আমরা যে আমাদের বাবার সন্তান। অনেকদিন পর কথাটা মনে পড়ল আজ।

রান্নাঘর থেকে চা বানিয়ে এনে মা আমাদের বলল, 'তোর বাবা নাকি তোদের আজ কী বলবে, বলেছে নাকি ?' মা বাবার দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আপনি বলেছেন ?'

'না, এখনো বলিনি, তোমার ছেলেমেয়েদের ভাবতে বলেছি।'

'আপনি কী না কী বলবেন ওরা তা ভেবে বের করেত পারবে না কি ?'

'পারবে না ?'

'না।'

'তাহলে আমি বলেই ফেলি।' বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী বলো ? সামনে আমাদের একটা বিশেষ দিন, সেদিন আমি একটা মাছ কিনব।' বাবা আপার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বল তো মা সেদিন কী মাছ কিনব ?'

'কী মাছ বাবা ?' আপা কাতর গলায় বাবাকে জিজ্ঞেস করে।

'চিতল মাছ, যদিও আস্ত একটা মাছ কেনার সামর্থ্য আল্লাপাক আমাকে দেননি, তাই কেজি খানেক কিনে আনব। এবার বলতো মা, চিতল মাছ কেন ?'

আপা ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা হাসতে হাসতে আপার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, 'চিতল মাছ তোর মায়ের খুব পছন্দ। কিন্তু একটা খারাপ ব্যাপার কী জানিস মা. এতগুলো বছর কেটে গেল, একদিনও তোর মাকে তার পছন্দের মাছটা কিনে খাওয়াতে পারিনি।'

'আপনি চুপ করেন তো।' মা কেমন যেন ফোত করে উঠে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে।

'বাবা—।' আমি বাবার দৃষ্টিটা মায়ের দিক থেকে সরিয়ে আনার জন্য বলি, 'তুমি বললে সামনে আমাদের একটা বিশেষ দিন, কিসের বিশেষ দিন বাবা ?'

বাবা কিছু বলেন না। কেবল আকাশের দিকে একবার ফিরে তাকান। আজ আকাশে চাঁদ নেই, তবু আমরা টের পাই-বাবার চোখ দুটো ভিজে উঠেছে কোনো এক আনন্দ-বেদনার মিশ্রণে, জ্যোৎস্নালোকিত উঁচু বৃক্ষের পাতার মতো চকচক করছে তার কাঁপা কাঁপা দুটো ঠোঁট।

তিনদিন হলো বাসা থেকে আবার পালিয়েছি। প্রতিবার চলে আসার সময় আর কাউকে না হোক মিতিকে বলে আসি, এবার তাও বলিনি। বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলি— আজ পালাব। তাই সন্ধ্যার সময় বেড়ানোর নাম করে সেই যে বাসা থেকে বের হয়ে এসেছিলাম, ফিরে যাওয়া হয়নি আর।

সমস্যা হলো আমার কাছে এ মুহূর্তে একটা কানা কড়িও নেই, কিন্তু খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। মনু আপা আমাকে দুইশ টাকা দিয়েছিল একটা কিছু কিনে নেওয়ার জন্য, কিছু কিনিনি আমি, সম্বল ছিল সে টাকাটাই । দুদিন খরচ করার পর যে কয়টা টাকা বাকি ছিল, একটু আগে শেষ করে ফেলেছি তা। হাইকোর্টের সামনে একটা লাশের পাশে বসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদছিল এক মহিলা। লাশটা একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। মহিলার কান্না দেখে এমন মায়া হলো পকেটে যা ছিল সব দিয়ে দিয়েছি তাকে। অথচ এই মহিলাকেই পরশুদিন ফার্মগেটের সামনে দেখেছি— একই রকম কাপড়ে ঢাকা লাশ, একই রকম করে চিৎকার করে কাঁদতে।

পেটের ভেতর কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। একটু বেশিই লেগেছে খিদেটা। কিন্তু এ মুহূর্তে কিছুই মাথায় আসছে না। আপাতত একটা কাজ করা যায়, ওই মহিলার কাছ থেকে কিছু টাকা ফেরত নেওয়া যায়।

আমি যে জায়গায়টায় দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে আবার হাই কোর্টের কাছে যেতে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা সময় লাগবে। এত ক্ষুধা নিয়ে আধা ঘণ্টা হাঁটা প্রায় অসম্ভব কিন্তু আমাকে হাঁটতে হবে, এ ছাড়া কোনো উপায় নেই আপাতত।

হাইকোর্টের সামনে এসে দেখি কাপড়ে ঢাকা লাশটা ঠিকই আছে কিন্তু সেই মহিলাটা নেই। মহিলাটির জায়গায় একটা বাচ্চা ছেলে বসে আছে। কান্না কান্না মুখ করে সে কিছুটা বলার চেষ্টা করছে লাশের আশপাশ দিয়ে যেতে থাকা মানুষজনকে, কিন্তু ঠিক সেভাবে বলা হচ্ছে না তার। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে আলতো করে বসে পড়লাম ছেলেটার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল সে। আমি মুখটা হাসি হাসি করে বললাম, 'কেমন আছো তুমি ?'

ছেলেটা বিরক্তি নিয়ে একবার ফিরে তাকাল আমার দিকে, কিন্তু কোনো কথা বলল না।

আমি আবার বললাম, 'কেমন আছো তুমি ?'

এবারও কথা বলল না সে। আগের মতোই কান্না কান্না মুখ করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এখানে একটু আগে যে বসে ছিল সে তোমার কে হয় ?'

ছেলেটা একটু রেগে গিয়ে বলল, 'জানি না।'

'জানি না মানে, সে তোমার মা হয় না ?'

'না।'

'তাহলে ?'

আবার চুপ হয়ে যায় ছেলেটা।

ছেলেটার আরো একটু কাছ ঘেঁসে বসে আমি একটু একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করি ওর। কিন্তু সে আগের চেয়েও বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি মুখটা হাসি হাসি করে ফেললাম। তারপর খুব নরম গলায় বললাম, 'খাওয়া দাওয়া করেছ ?'

রাগী স্বরে ছেলেটা বলল, 'না।'

'বলো কী, এত বেলা হলো এখনো তুমি খাওনি! কখন খাবে?'

'জানি না।'

'এত বেলা করে খেলে তো অসুখ করবে তোমার।'

'আমার তো অসুখ আছেই।'

আমি চমকে ওঠার মতো করে বললাম, 'কী অসুখ ?'

'প্যাটে বেদনা।'

'খুব খারাপ অসুখ। ঠিক আছে, এরপর তোমার সাথে দেখা হলে তোমাকে ঔষধ কিনে দেব আমি। তখন দেখবে পেটের ব্যথা একদম ক্লিয়ার।'

ছেলেটা কিছুটা প্রতিবাদী স্বরে বলল, 'আপনে আমারে অসুধ কিইন্যা দেবেন ক্যা ?'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি খুব ভালো ছেলে।'

'আমার মায়েও কয় এ কথাডা।'

'বলবেই তো, তুমি যে সত্যি সত্যি ভালো ছেলে।' আমি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলি, 'একদিন তোমাকে আমি বড় একটা ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাওয়াব। ঠিক আছে ?'

মাথা একদিকে কাত করল ছেলেটা।

'আচ্ছা, এ মানুষটা কে ?'

সামনের দিক থেকে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ছেলেটা বলল, 'কোন মানুষটা ?'

'এই যে, যে মানুষটা মারা গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ছেলেটি। তারপর সে আমাকে যা বলল তা শোনার পর মনে হলো আমার আর কোনো খিদে নেই। ছেলেটা কি এসব সত্যি বলেছে? আমি ভালো করে তার দিকে তাকালাম। একটু পর পর তার নাক দিয়ে নীল হয়ে জমে যাওয়া সর্দি বের হচ্ছে, আর সে তা সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে আবার নাকের ভেতর ঢোকাচ্ছে। সারা শরীরে ময়লা, চুলগুলো রুক্ষ, যেন অনেকদিন চিরুনি হাঁটেনি সে চুলে।

'এখানে যে মহিলাটি একটু আগে ছিলেন, উনি কোথায় গেছেন?'

'হোটেলে।'

'কোন হোটেলে?'

হাত দিয়ে রাস্তার ডান পাশটা দেখিয়ে দিল ছেলেটা। আমি উঠে দাঁড়িয়ে ডান দিকে এগুতে লাগলাম। কিছুদুর গিয়েই দেখি ফুটপাতে তিন-চারটা খাবারের দোকান। অ্যালুমিনিয়ামের বড় বড় ডিসের মধ্যে ঝকঝকে সাদা ভাত, প্লাস্টিকের কয়েকটা বাটিতে বিভিন্ন রকমের তরকারি, তরকারিগুলো কেমন যেন সব লাল রঙের। রিকশা থামিয়ে ভাত খাচ্ছেন কয়েকজন রিকশাওয়ালা। তারা এমনভাবে খাচ্ছেন যেন পৃথিবীতে এর চেয়ে মজার আর খাবার নেই। আমার পেটের ভেতর চিউ করে একটা শব্দ করে উঠল।

আরো একটু সামনের দিকে তাকাতেই দেখি মহিলাটি খাচ্ছেন। প্লেটে ভাত নেই, কিন্তু কী মাছের যেন একটা মাথা রয়েছে তাতে, খুব আনন্দ নিয়ে তিনি তা খাচ্ছেন, মজা করে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছেন। মানুষ কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের কথা বলে— সূর্যাস্তের ছবি সুন্দর, কাশবনের দৃশ্য সুন্দর, সমুদ্র কিংবা পাহাড় সুন্দর। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হলো— পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হচ্ছে তৃপ্তি নিয়ে একটা মানুষের খাবার খাওয়ার দৃশ্য।

মহিলাটি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাইরে এসেছেন। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে একটু শব্দ করে সালাম দিলাম, 'আসসালামু আলাইকুম।'

চমকে উঠলেন মহিলাটি। তাকে যে কেউ সালাম দিতে পারে তিনি এটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। মাথা নিচু করে ফেললেন তিনি।

মহিলাটির চমকে ওঠার রেশ শেষ না হতেই আমি বললাম, 'আপনি কেমন আছেন?'

আগের মতোই অবাক হয়ে আবার আমার দিকে তাকালেন তিনি। আমি আবার বললাম, 'চিনতে পেরেছেন আমাকে?'

দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে মহিলাটি বললেন, 'না।'

'চিনতে পারেননি! ওই যে কিছুক্ষণ আগে আপনার স্বামীর লাশ সৎকারের জন্য কয়েকটা টাকা দিলাম আমি। আপনি টাকাটা নিয়ে দোয়া করলেন আমাকে— আল্লা যেন ভালো রাখে আমাকে। মনে পড়েছে?'

মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে একটু চুপ থাকার পর বললেন, 'জি।'

'এবার বলুন আপনি কেমন আছেন ?'

'ভালো না।'

'ভালো না থাকারই কথা, এসব কাজ করতে কারইবা ভালো লাগে।'

'জি!' মহিলাটি আবার চমকে উঠলেন।

মহিলটির সঙ্গে সঙ্গে আমিও বললাম, 'জি।' তারপর তার দিকে একটু গভীরভাবে তাকালাম, 'প্রতিদিন লোকটাকে কত দিতে হয় ?'

কথাটা যেন তিনি বুঝতে পারেননি এমনভাবে বললেন, 'কাকে ?'

'যাকে লাশ সাজিয়ে শুইয়ে রেখেছেন ?'

ফ্যালফ্যাল করে মহিলাটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আপনি কী করে জানেন ওটা সাজানো লাশ ?'

'আমি জেনেছি।'

'কতটুকু জেনেছেন ?'

'কিছুটা।'

'আর কী জানতে চান ?'

কিছুটা সাহসের সঙ্গে বেশ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছেন মহিলাটি। এ ধরনের মানুষ সাধারণত এত শুদ্ধ ভাষায় এবং এভাবে কথা বলে না। আমি একটু ভালো করে তাকালাম। তিনি আমাকে আবার বললেন, 'বলুন, আপনি আর কী জানতে চান ?'

'প্রতিদিন কত দিতে হয় লোকটাকে?'

'দুইশ টাকা।'

'পুলিশকে ?'

'একশ'।

'ওই বাচ্চা ছেলেটাকে?'

'পঞ্চাশ।'

'আপনি ?'

'দুপুরের খাবারসহ নব্বই টাকা।'

'বাকি টাকা ?'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন মহিলাটি, কিছুক্ষণ চুপ থাকেন, কিছু একটা ভাবেন, তারপর বলেন, 'যারা লোকটাকে অসুধ খাইয়ে এভাবে অচেতন করে রাখে, যারা আমাকে কান্নাকাটি করার জন্য টাকা দেয়, যারা পুলিশকে শান্ত রাখে, বাকি টাকা তারাই নেয়। আরো শুনবেন ?'

'নাহ্।' মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আমি এবার মনে মনে বলি, 'আপনার স্বামী আপনাকে ছেড়ে গেছে সে কবেই। তারপর আপনি একা। আপনার ঠাঁই হয় না কোথাও। অবশেষে একদিন আপনার সমস্ত সম্বল দুটো পুরাতন কাপড়, এক জোড়া ক্ষয়ে যাওয়া স্যান্ডেল, বিয়ের স্মৃতি ছোট্ট একটা সোনার নাকফুল আর এটা ওটা জড়িয়ে রাখা একটা পোঁটলা নিয়ে আপনার এই শহরে আসা। অপরিচিত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে আপনার স্বপ্নের প্রথম ভাঙনটা শুরু হয় একটু পরেই-না, এ শহরে আপনার জন্য কোনো কাজ নেই। ক্লান্তি আর হতাশায় ফুটপাতের কোনো এক জায়গায় রাতে চোখ ঝেপে আসা ঘুম, সকালে উঠেই দেখলেন পরনের কাপড়টা ছাড়া আর কিছুই নেই আপনার সঙ্গে, কে যেন চুপি চুপি নিয়ে গেছে সবকিছু। আপনি কাঁদতে শুরু করলেন, কিন্তু এ নাগরিক শহরে কেউ আপনার সে কান্না শুনল না। যেমন এখনো কেউ শোনে না।

অতঃপর এই আপনি শত লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমান, দুঃখ আর কষ্টের পর এই আমার সামনে দাঁড়িয়ে। অনিশ্চয়তা দিয়ে আপনার শুরু হয়েছিল সে অনিশ্চয়তার পথেই রয়েছেন।

আরো বলব ?

একদিন আপনি এভাবেই ফুটপাতে পড়ে থাকবেন, অনেকক্ষণ। কেউ আপনার অবস্থা জানতে চাইবে না, এমনকি আপনার দিকে ফিরেও তাকাবে না। শেষে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের গাড়ি এসে নিয়ে যাবে আপনাকে। আপনার চির শান্তির পথে ওরা আরো একটু এগিয়ে দেবে আপনাকে।'

মাথা নিচু করে খুব অবহেলিতের মতো চলে যান মহিলাটি, শান্ত পায়ে ক্লান্ত মনে। কেবল ছোট্ট করে একটা সালাম দিয়ে। আর তার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে নিজেকেই তখন বড্ড অচেনা মনে হয় আমার।

অনেকক্ষণ পর পেটের ভেতর আবার শব্দ করে উঠল। খিদাটা এখন বেশ চরমে উঠেছে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এখনো। একটা কিছু করা দরকার, কিন্তু কী করব ভেবে পাচ্ছি না।

ফুটপাত দিয়ে হাঁটা শুরু করি আমি। ইদানীং হাঁটতে বেশ ভালো লাগে। এই ভালো লাগার একটা কারণও আছে— হাঁটতে হাঁটতে অসংখ্য মানুষ দেখা যায়। বেইলী রোডে একটা মেয়েকে আমি প্রায়ই দেখি। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে উদাস হয়ে কীঊ যেন দেখে। পাগলের মতো দেখতে মেয়েটার চোখে হঠাৎ হঠাৎ পানিও দেখা যায়। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে— কিছুদিন পর পরই মেয়েটার পেটটা একটু উঁচু দেখা যায়, সে পেটটা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, এক সময় সেটা এত বেশি উঁচু হয়ে যায়, সবাই তার দিকে একবার হলেও ফিরে তাকায়। হঠাৎ

একদিন মেয়েটাকে দেখা যায় না এবং অনেকদিন দেখা যায় না। বেশ কয়েকদিন পর তাকে আবার হঠাৎ দেখা যায়। আশ্চর্য, তার ফুলে ওঠা পেটটা তখন উধাও। তাকে বেশ রোগা রোগা দেখা যায় তখন, মুখটা পানশে মনে হয়, কেবল তার মাথার চুলগুলো একটু পারিষ্কার মনে হয়, যেন এ কয়দিন কে যেন যত্ন করে আঁচড়িয়ে দিয়েছে তার চুলগুলো।

আমি একদিন মেয়েটির খুব কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনাকে দেখে আমার কী মনে হয় জানেন ?'

তালশাঁসের মতো ফ্যাকাসে চোখে মেয়েটা আমার দিকে তাকাল, কিছু বলল না। আমি গলাটা খাদে নামিয়ে বললাম, 'আপনি কি আমার কথাটা শুনতে পেয়েছেন ?'

মেয়েটা এবার আমার দিকে ফিরে তাকালও না, কথাও বলল না। আমি হাসতে হাসতে তাকে বলি, 'প্রতারিত অনেকেই হয়, সে অন্যের দ্বারা। কিন্তু নিজেকে নিজে প্রতারিত করার চেয়ে খারাপ কিছু আর নেই। আপনি কী বলেন ?'

মেয়েটা কাঁদতে থাকে, আমি আর কিছু বলি না।

বেইলী রোডের দিকে পা বাড়াই আমি। অনেকদিন মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয় না। আজ দেখা হলে কিছু একটা বলব তাকে।

দুপুর আর বিকেলের মাঝখানটা কেমন যেন নির্ভার। এ সময়টাতে কারোই কিছু করার থাকে না। সরকারি অফিসের কোনো কোনো কর্মকর্তা টেবিলে মাথা রেখে ঝিমায়, নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীরা দৈনিক পত্রিকার একই খবর বারবার পড়ে, এমন কি বিজ্ঞাপনগুলোও, পার্কের ঘাস কিংবা সিমেন্টের বেঞ্চে শুয়ে ঘুমায় ঠিকানাহীন মানুষগুলো, কেউ কেউ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, আমার মতো।

বেইলী রোডে এসে দেখি মেয়েটি নেই। সে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে একটা নেড়ি কুকুর শুয়ে আছে। আমি তবু এগিয়ে গেলাম সেদিকে এবং দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। গাইড হাউসের সামনে চারটা ছেলে কী যেন বলাবলি করছে আর হাসছে। আমি ওদের কাছাকাছি গিয়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলাম এবং শুনে ফেললাম। তারপর ওদের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকাতেই দেখি রাস্তার উল্টো পাশে শাড়ির দোকানের সামনে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি বলে দিচ্ছে কারো জন্য অপেক্ষা করছে সে।

আমি আস্তে আস্তে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কাছাকাছি যেতেই কিছুটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মেয়েটা আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার সামনের দিকে তাকাল। এ অবজ্ঞাকে আমি মোটেই পাত্তা দিলাম না। আমি আরো একটু এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালাম। মেয়েটা এবার আমাকে খেয়ালই করল না। মুখটা হাসি হাসি করে আমি বললাম, 'এক্সকিউজ মি।'

মানুষের অনেক ধরনের দৃষ্টি দেখেছি আমি, কিন্তু এটা যে কোন ধরনের দৃষ্টি তা এই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম না। মেয়েটা আমার দিকে সে রকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কিছু বলবেন ?'

'ঠিক সে রকম কিছু না। আচ্ছা, আপনি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছেন ?'

'এটা আপনাকে বলতে হবে ?'

'না, এটা আমাকে বলতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'তাহলে ?'

'এমনি জানতে ইচ্ছে করল আর কী।'

'ধরুন আমি করো জন্য অপেক্ষা করছি, তো ?'

'অপেক্ষার একটা মজা আছে জানেন ?'

মেয়েটা আমার দিকে এবার একটু ভালো করে তাকাল। তারপর কিছুটা নির্লিপ্তভাবে বলল, 'তাই ?'

'কষ্টও আছে, তবে তার চেয়ে মজাটাই বেশি।'

'বেশ অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে আপনাকে। কখনো কারো জন্য অপেক্ষা করেছেন?'

'না তো।'

'তাহলে অপেক্ষার কষ্ট কিংবা মজা বোঝেন কীভাবে ?'

'কীভাবে বুঝি ?' আমি একটু হেসে বলি, 'অপেক্ষা যে করি না তা না। একটা সুন্দর সময়ের অপেক্ষা আমরা প্রত্যকেই করি। একটা সুন্দর মানুষের জন্য করি, একটা পূর্ণ জীবনের জন্য করি, এমনকি একটি ফুলের জন্যও করি।'

আবার মেয়েটা আমার দিকে তাকাল, তবে এবারের দৃষ্টিটা একটু নরম মনে হলো। আমি তাকে বললাম, 'আমি একই সঙ্গে আপনাকে সরি জানাচ্ছি, আবার ধন্যবাদও দিচ্ছি।'

'কেন?'

'এতক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করার জন্য সরি। আর এই যে সময়টুকু আপনি আমাকে দিলেন তার জন্য ধন্যবাদ।'

মুচকি একটা হাসি দিল মেয়েটা।

'আরেকটা জিনিস আপনাকে বলতেই হয়, আপনার সাহস আছে। এই আমার মতো কেউ একজন আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কোনো কিছু একটা করে বসে পারত।'

আগের মতোই হাসতে হাসতে মেয়েটা বলল, 'কী করে বসে পারত?'

'এই ধরুন ছিনতাই কিংবা...।'

আমার কথাটা শেষ করার আগেই মেয়েটি বলল, 'কেউ আমার কাছ থেকে কিছু ছিনতাই করবে আর আমি বসে থাকব ? ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন আমার একটা ব্ল্যাক বেল্ট আছে।'

'কনগ্রাচুলেশন্স।'

মেয়েটা কিছুটা কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কি আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন ?'

'জি।'

'কী ?'

'আমার মাথার ডান পাশ দিয়ে রাস্তার ওপাশে তাকান, কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

'জি।'

'কী দেখতে পাচ্ছেন ?'

'চারটা ছেলে বসে আছে।'

'ওরা আমার কেউ না। ওরা একটা বাজি ধরেছিল আপনাকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে বাজি ?'

'হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে। ওদের কেউ যদি আপনার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারে তাহলে সে একশ' টাকা পাবে। আমি আপনার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলেছি, সে একশ' টাকা এখন আমি পাব। যদিও ওদের সঙ্গে এ বাজি নিয়ে আমি কোনো কথা বলিনি, তবু আপনার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে ওদের বলব, ভাইজান, আমি ওই মেয়েটার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলেছি, আপনারা কি আমাকে একশটা টাকা দিতে পারেন, আমি খুব ক্ষুধার্ত।'

'আপনি ক্ষুধার্ত!'

'খুব, সেই কাল রাতে একবার খেয়েছি, এখন পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে।'

হঠাৎ একটা লাল টকটকে গাড়ি এসে থামল মেয়েটির সামনে। ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে দিতেই গাড়িতে উঠল সে, তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

'কোথায় ?'

'আসতে বলছি আসুন।'

কিছুটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি মেয়েটার পাশে গিয়ে বসলাম।

পিন পতন নীরবতা নিয়ে আমি বসে আছি গাড়ির ভেতর। যতটুকু জায়গা না হলেই নয় ঠিক ততটুকু জায়গাতেই বসে আছি। একটু নড়াচড়া করতে পারছি না, যদি সেটা আবার অভদ্রজনিত কিছু হয়ে যায়। আমার এ অবস্থা দেখে মেয়েটা এই প্রথম একটু শব্দ করে হাসল, তারপর বলল, 'আমি চৈতী, আপনি ?'

'জি ?'

মেয়েটা আগের মতোই হাসতে হাসতে বলল, 'আমি আপনার নাম জিজ্ঞেস করেছি।'

'অ, আমি দন্ত্যন।'

'হোয়াট?'

'আমার নাম দন্ত্যন রুহমান।'

আমার নামটা হজম করতে চৈতী একটু সময় নিল। কিছুক্ষণ পর সে খুব স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করল, 'এ নামটা কে রেখেছে?'

'আমি নিজেই রেখেছি।'

'এ রকম নাম রাখার কারণ?'

'কোনো কারণ নেই।'

'তাহলে আমি আপনাকে ডাকব দন্ত্যন বলে, তাই তো?'

'জি।'

'তা দন্ত্যন সাহেব, আপনি এভাবে পাথরের মতো বসে আছেন কেন?'

আমি একটু সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলাম।

গাড়িটা এসে যেখানে থামল, এ জায়গাটায় আমি জীবনেও আসিনি। ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দিতেই চৈতী গাড়ি থেকে নামল, তারপর আমাকে নামতে বলল। কী অদ্ভুত! নিঃসংকোচে চৈতী আমার একটা হাত ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রতিটা গেট পারি হচ্ছি আর বুক ধুকধুক করছে আমার— এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অবশেষে একটা বড় হলরুমের কাছে এনে চৈতী আমাকে বলল, 'এটা একটা ফাইভ স্টার হোটেল।'

শংকিত চিত্তে হোটেলটার চারপাশটা একবার দেখে নিলাম আমি। থরে থরে খাবার সাজানো— কত রকমের খাবার, কত রঙের খাবার! মুখের ভেতর কোথা থেকে যেন একগাদা পানি এসে জড়ো হলো। চৈতী খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে সে নিজেও বসে বলল, 'আজ আমি আপনাকে খাওয়াব। তার আগে কথা হলো— এখানে প্রায় নব্বই রকমের খাবার আছে। যদি আপনি এখান থেকে মাত্র একটি খাবার খান তাহলে আপনাকে এগারশ' টাকা পে করতে হবে, আর যদি আপনি সবগুলো খাবারই খান তাহলেও আপনাকে এগারশ' টাকা পে করতে হবে। সুতরাং আপনি এখন সবগুলো খাবারই খাবেন। আপনি একটা একটা করে খাবার খাবেন আর আমি মুগ্ধ হয়ে আপনার সে খাওয়া দেখব।'

চোখ ভিজে যায় আমার। আমি এখন এগারশ' টাকার খাবার খাব! অথচ এই এগারশ' টাকা দিয়ে আমাদের সংসারে সাতদিনের খাবার হবে, তা থেকে একটু কষ্ট করে বাঁচিয়ে মায়ের জন্য একটা অল্প দামের শাড়ি হবে কিংবা লুবার জন্য কয়েকটা বই কিনতে পারব আমরা।

আলোয় ভরা চারদিকটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে আমার!

সারাদিন কেটে গেল, অথচ একবারও আকাশ দেখা হয়নি আজ। আকাশের দিকে তাকালাম আমি, জোনাক জ্বলা আকাশ। আমি নিশ্চিত জানি বাবাও এখন আকাশ দেখছেন। ঘুমানোর আগে এই সময়টাতে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসেন বাবা। চুপচাপ আকাশ দেখেন, একদৃষ্টিতে আকাশ দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রায়ই তিনি বলে ওঠেন— আই টু ডাই, ইউ টু লিভ, হুইচ ইজ বেটার, ওনলি গড নোজ।

সক্রেটিজের এই দুঃখজাগানিয়া কথাটা বাবার মুখ থেকে শুনতে শুনতে আমরা মন খারাপ করে ফেলি, অথচ বাবা কথাটা বলেন আর হাসেন। রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে বাবার হাসিটা মাঝে মাঝে এতো বেশি জোরে শোনায়, আমাদের মনে হয় আকাশের ওপাশে বসে থাকা স্রষ্টা একটুক্ষণের জন্য হলেও এ সময়টাতে ফিরে তাকান বাবার দিকে।

কী আশ্চর্য! বাবা আকাশ দেখছেন, আমিও দেখছি, দুজনই আকাশ দেখছি, কিন্তু দুজন দুজনকে দেখছি না। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় আমার, এ মুহূর্তে একাকী হয়ে যাই আমি, পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে একদম একা।

মানুষের শত ব্যস্ততা আর হাজার কপটতা শেষে রাতের এই একাকিত্ব, ভালোই লাগে। নিরন্তর শব্দদূষণের পর চারপাশে এই নীরব হতে যাওয়া সময়ে মনে হয়— এই আমি, হ্যাঁ আমি, গড়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ মরে যাওয়ার পরও নিঃশ্বাস নিতে পারছি, সবুজ পাতা আর লাল নীল ফুলের মাঝে উল্লসিত প্রজাপতি দেখছি, ভরা চাঁদের আকাশ আর লেজ নাচানো পাখির মন কেমন করা ডাক শুনছি, আমি বেঁচে আছি, দিব্যি বেঁচে আছি!

সারারাত আজ হাঁটব আমি, ইচ্ছেমতো রাস্তার ব্যাসার্ধ নিয়ে হাঁটব। হন হন করে কেউ হেঁটে যেতে যেতে গায়ে অভদ্রজনিত ধাক্কা দেবে না, ব্যস্ততার খোলসে কাউকে পড়ে যেতে দেখতে হবে না কোনো ম্যানহোলে কিংবা ডাস্টবিনে, কোনো উচ্চপদস্থ দেশসেবকের জন্য রাস্তা খালি করে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েও থাকতে হবে না এক পাশে। সারাদিনের বিচিত্র জটিলতা শেষে সত্যিকারের ধারাবাহিক হেঁটে যাওয়া, যেদিকে মন চায়, চোখ যায়।

বাসা থেকে পালিয়ে বাইরে এখন আর রাতে ঘুমাই না আমি। হাঁটি, নিশাচর প্রাণীর মতো হাঁটি। একটুও ঘুম আসে না আমার। কারণ, কোথায় ঘুমাব ? দিনে কোনো পার্ক কিংবা গাছের নিচে ঘুমানো যায়, কিন্তু রাতে ? মসজিদে একদিন ঘুমিয়ে ছিলাম আমি, বাড্ডার কাছে এক মসজিদের বারান্দায়। আমার পাশে আরো তিন-চারজন ঘুমিয়ে ছিল। মাঝরাতের দিকে কে যেন ঘুম থেকে ডেকে তোলে আমাকে। এই মাত্র ঘুমিয়েছি, ভীষণ বিরক্ত হয়ে চোখ মেলে তাকালাম। মসজিদের বারান্দায় একটা লাইট জ্বলছে, সে আলোতে দেখি হুজুরদের মতো লম্বা পাঞ্জাবি পরা এক লোক আমার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন, মাথায় টুপিও আছে তার। আমি দ্রুত উঠে বসতেই তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।'

ফ্যালফ্যাল করে আমি লোকটার দিতে তাকালাম। অনেক হুজুর যেমন সহী করে আরবি বলার জন্য গলার ভেতর থেকে শব্দ বের করে, ঠিক সেভাবে লোকটি বললেন, 'সালামের উত্তর দেওয়া সুন্নত।'

সালামের উত্তর দিলাম আমি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে বললেন, 'এ জায়গাটা ভালো না, যদিও এটা আল্লার ঘর। আজকাল আল্লার ঘরেও কুফরি কাজ-কাম হয়, চুরি-ডাকাতিও হয়। আমি এ মসজিদের একজন খেদমতদার। তাই বলছিলাম কী, আপনার কাছে যদি কোনো অর্থ-সম্পদ থাকে তাহলে আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে পারেন, সকালে আবার সেগুলো আমার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে যাবেন। না হলে এই রাত-বিরাতে আপনি ঘুমিয়ে পরলে কে না কে এসে সবকিছু লোপাট করে নিয়ে যায়। শেষে আমাদের মসজিদের নিন্দা হবে, নাউজুবিল্লাহ।'

খুব বিনীত গলায় আমি বললাম, 'হুজুর, আমার কাছে তো তেমন কিছু নাই।'

'সামান্য অর্থ-কড়িও নাই ?'

'না।'

'বলেন কী!'

'জি। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, এখানে ওখানে খাই।'

লোকটা আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনাকে তো তেমন মনে হয় না।'

'হুজুর, মানুষের বাইরেরটা দেখেই কি সব বোঝা যায়, আল্লাহপাক মানুষের বাইরেরটা করেছেন এক রকম, ভেতরেরটা করেছেন আরেক রকম।' হুজুরের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেই আমি নিজেই বেশ অবাক হয়ে গেলাম, একেবারে পাক্কা হুজুরের মতো কথা বললাম যে!

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে হুজুর আমার পাশের লোকটার পাশে বসলেন। তারপর মাথায় হাত দিয়ে জাগিয়ে তুলে আমাকে এতক্ষণ যা বলেছিলেন তাকেও তা

বললেন। লোকটা অবুঝের মতো হুজুরের দিকে তাকাতেই হুজুর কিছুটা গাম্ভীর্যের সাথে হাসতে হাসতে তাকে বললেন, 'আপনি কী করেন ?

'খেজুর বেচি।'

'সৌদি আরবের খেজুর ?'

'জে।'

'মাশাল্লাহ। আমাদের নবী করিম সাহেব খেজুরের ব্যবসা করতেন, বড় সহী ব্যবসা। তা আপনার আয়-রুজি কেমন ?'

'ভালোই।'

'ভালো তো হতেই হবে, আমাদের নবী করিমের ব্যবসা না। আমাদের নবী করিম প্রথম জীবনে তিনটা খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি করে পানি তুলে দিতেন এক কাফেরকে। পানি তুলতে তুলতে আমাদের নবীজির হাত কেটে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতো, নবীজি তবুও ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে পানি তুলতেন। আপনি সেই খেজুরের ব্যবসা করেন, বড় তাইয়্যিব।' নবীজির হাত দিয়ে রক্ত ঝরার মতো হুজুরের চোখ দিয়েও পানি ঝরতে থাকে। একসময় হুজুর চোখ মুছতে মছতে বলেন, 'আপনি কি জানেন তাইয়্যিব মানে কী ?'

লোকটা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'জানি না।'

'তাইয়্যিব মানে উত্তম। আচ্ছা, বলেন তো নবীজি খেজুরকে কী বলে ডাকতেন ?'

আগের মতোই লোকটা বলল, 'জানি না।'

'তামার, তামার মানে খেজুর। বলুন আলহামদুলিল্লাহ।'

লোকটা ভক্তির সঙ্গে বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ।'

'সোবাহানাল্লাহ, খুব সহী করে আলহামদুলিল্লাহ বললেন আপনি। তা, আপনি কি আপনার সমুদয় সম্পদগুলো আমার হেফাজতে রাখবেন ? যদি আপনার মনে কোনো অবিশ্বাস জন্মে তাহলে দরকার নেই। আবার বলি কী, জায়গাটা ভালো না। যদি আপনার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়!'

লোকটা তার কোমরের কাছে লুঙ্গির গিট থেকে ছোট্ট একটা পুঁটলি বের করে হুজুরের দিকে এগিয়ে দিল। হুজুর পোঁটলাটা নেওয়ার আগে লোকটাকে বললেন, 'এখানে কত আছে?'

'নয়শ আশি টাকা।'

'কম বা বেশি নেই তো।'

'না, আমি গুনে রাখছি।'

'জনাব, আপনি কি আবার গুনে দেখবেন? ভুল-ত্রুটি তো হতে পারে, মানুষ মাত্রই তো ভুল-ত্রুটি হয়।'

'না ঠিক আছে।'

'ফি আমানিল্লাহ।' হুজুর টাকার পুঁটলিটা হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকা পাশের দুটো লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওনাদের চেনেন নাকি?'

'জে। ওরা আমার আত্মীয়, সন্ধ্যার সময় কুমিল্লা থেকে আইছে।'

'ওনাদের কাছে কোনো অর্থ সম্পদ—।' হুজুর কিছুটা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে লোকটা দিকে তাকালেন।

'না না, ওরা খালি হাত-পায়ে আইছে, কিচ্ছু নাই ওদের কাছে।'

'ঠিক আছে, আপনি এখন ঘুমান। ফজরের নামাজের সময় আমার কাছে গচ্ছিত আপনার এ সম্পদ আপনাকে কাছে বুঝিয়ে দেব আমি। দোয়া রাখবেন, আল্লাপাক ততক্ষণ যেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।'

খুব সকালে ভীষণ চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায় আমার। আলতো করে চোখ মেলে দেখি, এখনো বেশ অন্ধকার। ফজরের নামাজ পড়ার জন্য মুসুল্লিরা মসজিদে এসেছেন। তারা কাকে যেন ঘিরে দাঁড়িয়েছেন মসজিদের সামনে। সেখান থেকে কে যেন চিৎকার করে কাঁদছে।

ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। মুসুল্লিদের পাশ কেটে ভিড়ের মাঝখানে তাকিয়েই কিছুটা চমকে উঠলাম। খেজুর বিক্রি করা লোকটা চিৎকার করে কাঁদছে আর বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে— আমার টাকা নিয়া গেছে, আমার টাকা নিয়া গেছে।

মুসুল্লিদের কেউ একজন বললেন, 'কে নিয়ে গেছে ?'

জবাবাটা শোনার আগেই আমি সরে এলাম সেখান থেকে। আমি তো জানি কে নিয়েছে টাকাগুলো। দেশের সেবক সেজে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পালাক্রমে আমাদের রাষ্ট্রের সম্পত্তি লুটে নিচ্ছে কেউ কেউ, আর এ লোকটার টাকাগুলো ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেছে কেউ একজন মসজিদের খেদমতকারি সেজে!

তারপর থেকে মসজিদে আর ঘুমানো হয় না আমার।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসেছি। রাস্তায় মানুষজন কমে এসেছে একদম। এখন ক্লান্ত লাগছে একটু। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অল্পক্ষণের জন্য শুতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু কোথায় শোয়া যায় ? টিএসসির ফুটপাত, রমনার সিমেন্টের বেঞ্চ অথবা হাইকোর্টের মাজারের পাশে। না, আরেকটা জায়গায় শোয়া যায়— কাওরান বাজারের ফুটপাতে।

বেশ কয়েকদিন আগে এভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে কাওরান বাজারে এসে দেখি সারি সারি হয়ে কয়েকশ মানুষ শুয়ে আছেন ফুটপাতে। এদের অনেকই শুয়ে আছেন আবার একটা বাঁশের টুকরির ভেতর। ছোট ধরনের সেই টুকরির ভেতর পিঠ ঠেকিয়ে তারা ঘুমিয়ে আছেন। খোলা আকাশের নিচে তাদের

এ নিশ্চিন্ত ঘুমানো দেখে মনটা ভরে গেল আমার। অভিজাত এলাকা বলে পরিচিত জায়গাগুলোর রাস্তাতে আমি প্রায়ই ঘুরে বেড়াই। জীবনের আকাশছোঁয়া রূপ দেখি, আভিজাত্যের অবাঞ্ছিত মহড়া দেখি, গর্ব আর উদ্ধত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইট পাথরের আবাস দেখি। তার চেয়েও বেশি দেখি ঘুমের ঔষধের প্যাকেট। রাস্তার পাশে, ফুটপাতে, ডাস্টবিনে হাজার হাজার ঘুমের ঔষধের খালি প্যাকেট। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নিরাপদ কক্ষ, শুভ্রতাজড়ানো বিছানা আর পাখির পালকের বালিশেও তাদের ঘুম আসে না। কয়েকশ' বছরের খাবার কেনার টাকা ব্যাংকে সঞ্চিত করার পরও দুশ্চিন্তায় তাদের রাত কাটে, প্রখর ভূমিকম্পেও অটল থাকা সম্পন্ন ছাদের নিচে তারা নিজেদের অনিরাপদ ভাবেন, নিশ্চিন্ত জীবনের সুবাতাসেও তারা জটিলতার গন্ধ পান। তখন তাদের এই ঘুমের ওষুধই ভরসা।

বাঁশের একটা টুকরির সামনে গিয়ে আমি পূর্ণ চোখে সেখানে শুয়ে থাকা বৃদ্ধের দিকে তাকালাম। শিশুর মতো সরলতা আর সুখী মানুষের প্রশান্তিতে ঘুমাচ্ছেন তিনি। মৃদুমন্দ বাতাসে তার সফেদ দাড়িগুলো অল্প অল্প নড়ছে, ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক হয়ে আছে, যেন তিনি হাসছেন, নিষ্পাপ হাসি। অসম এই জীবন বাহিত করেও তার চেহারায় কোনো খেদ নেই, অভিযোগের চিহ্ন নেই— নিজের প্রতি, অন্য কারো প্রতি, এমনকি স্রষ্টার প্রতি। সমস্ত চেহারায় ঝুলে আছে পবিত্র এক স্বর্গীয় আভা।

বৃদ্ধটি চোখ খুললেন হঠাৎ। ভাবলেশহীন চোখে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে দেখে উঠে বসলেন। তারপর কিছুটা ভীত, কিছুটা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, কিছু বলবেন ?'

'না, আপনাকে দেখছিলাম।'

'আমাকে!' লজ্জামাখা গলায় বললেন বৃদ্ধটি।

'আপনার ঘুমানো দেখে আমার বেশ ঈর্ষা হচ্ছিল।'

'কেন ?'

'কী নিশ্চিন্ত ঘুম আপনার!'

'সারাদিন অনেক কাজ-কাম করতে হয় তো, রাতে তাই ঘুমটা ভালো হয়।' একটু হাসার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধটি।

তার দেখা দেখি আমিও একটু হেসে বললাম, 'এ দেশের কিছু লোকের যদি আপনার মতো ঘুম হতো, তাহলে প্রতিটা সকাল আমাদের অনেক সুন্দর হতো!'

বৃদ্ধটি কী বুঝলেন, আগের মতোই হাসতে লাগলেন তিনি এবং হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন।

'স্যরি, আপনার ঘুম ভেঙে দিলাম।'

'না না, একটু পরেতো উঠতেই হতো। মাঝরাতের পরই তো সারাদেশ থেকে তরিতরকারি আসে এই কাওরান বাজারে।'

'এই টুকরিতে তরকারি বহন করে দিনে কত টাকা আয় হয় আপনার ?'

'হয়।' কিছুটা লজ্জিত মনে হয় বৃদ্ধটাকে।

'যা হয় তা দিয়ে চলে ?'

আগের মতো ছোট্ট করে উত্তর দেন, 'চলে।'

'একটা অনুরোধ করব আপনাকে?'

'অনুরোধ!' বৃদ্ধটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'কিসের অনুরোধ?'

'আপনার এই টুকরিতে কিছুক্ষণের জন্য একটু শোব আমি।'

কিছু বললেন না বৃদ্ধটি। কাঁধের গামছা দিয়ে তিনি টুকরিটা খুব যত্ন করে ঝারতে লাগলেন। তারপর ঝারা শেষে বললেন, 'পারবের শুতে ?'

'দেখি না চেষ্টা করে, সম্ভবত পারব।'

টুকরিতে বেশ কৌশল করে শুতে হয়, না হলে যে-কোনো দিকে কাত হয়ে যায়। বৃদ্ধ মানুষটি টুকরিটা হাত দিয়ে ধরে রাখলেন, আমি চিৎ হয়ে শোয়ার মতো কুঁজো হয়ে শুয়ে পড়লাম সেটাতে। একটু পরই কেমন যেন ভয় লাগতে থাকে আমার। রাস্তার পাশে ফুটপাতের ওপর শুয়ে আছি, পাশ দিয়ে শো শো করে ট্রাক যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, স্কুটার যাচ্ছে। প্রতিটা বাস-ট্রাক যায়, মনে হয় এই বুঝি শরীরের ওপর এসে উঠল, থেতলে দিয়ে গেল দেহটা।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ খেয়াল হয় আমার, আমি আকাশের নিচে শুয়ে আছি, সম্পূর্ণ খোলা আকাশের নিচে। খুব অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। আমি অবাক থেকে অবাকতর হচ্ছি, আকাশটা আমাকে ঘিরে রেখেছে, বিশাল বড় একটা মশারির মতো আচ্ছাদিত করে রেখেছে। আমার মনে হচ্ছে এ পৃথিবীতে কেবল আমি একাই বেঁচে আছি, আমি একাই শুয়ে আছি এ আকাশের নিচে। আমাকে ঘিরে সমস্ত আকাশটা গোল হয়ে নেমে গেছে চারদিকে, সে আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্ররাজি জ্বলছে, সে আমার জন্যেই, আমার জন্যই এত আয়োজন। ছোটকালে জোনাক পোকা ধরে মশারির ভেতর ছেড়ে দিতাম, সারারাত মশারির ভেতর জোনাকি পোকাটা জ্বলত আর উড়ত, ইচ্ছে হলেই পোকাটা হাত দিয়ে ছুঁতে পারতাম। এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই আমি আকাশ ছুঁতে পারব, টিপ টিপ করে জ্বলা তারাগুলো ধরতে পারব, এই তো আমার মুখের সামনেই, আমার হাতের কাছেই।

•

বেশ কয়েক কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেছে, ঘুম পাচ্ছে এখন একটু একটু। কাওরানবাজারে বৃদ্ধ মানুষটির কথা মনে পড়ছে এ মুহূর্তে, একটা কথা বলব আজ

তাকে। আমি নিশ্চিত জানি, কথাটা শুনে তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবেন, আর আমি তার এভাবে তাকানো দেখে রহস্যময় একটা হাসি দেব।

কাওরানবাজারের দিকে হাঁটতে লাগলাম আমি।

নীলক্ষেত থেকে এলিফ্যান্ট রোড়ে যাওয়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। রাতে এ রাস্তাটায় লোকজন একদম কমে যায়, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে জায়গাটা। অথচ দিনেরবেলা এখানে টিয়ার ডাক, পেঁচার ডাক, কবুতরের ডাক, কুকুরের ডাক, শেয়ালের ডাক, খরগোসের ডাক— সব একসঙ্গে শোনা যায়, সবকিছু খাঁচায় ভরে বিক্রি হয় এখানে।

কাটাবন আসার আগেই থমকে দাঁড়ালাম। কোথা থেকে একটা ছেলে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। খুব শান্ত চোখে আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে তার চেয়েও শান্ত গলায় বলল, 'আপনার কাছে ম্যাচ হবে ?'

ছেলেটার দিকে আমি ভালো করে তাকালাম। প্রায় আমার বয়সী, ক্লিন সেভড। মাথার চুলগুলো একেবারে আর্মি ছাঁট, তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে ট্রাফিক সার্জেন্টের মতো সে এ অন্ধকার রাতেও সানগ্লাস পড়ে আছে চোখে।

আমি বললাম, 'নেই।'

'লাইটার ?'

'সেটাও নেই।'

'তাহলে আছেটা কী ?'

'কিছু একটা তো আছেই।' আমি আমার প্যান্টের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে বললাম, 'কিন্তু আপনার তো দরকার ম্যাচ অথবা লাইটার।'

'অন্য কিছু হলেও চলবে।'

'চলবে ?' মুচকি একটা হাসি দিলাম আমি।

কিছুটা হকচকিয়ে গেল ছেলেটা। আমি এক পা এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার ডান কাঁধে একটা হাত রাখলাম। তারপর খুব আন্তরিকভাবে বললাম, 'আর দুজন কই ?'

'আর দুজন মানে, আর দুজন কে ?'

'আপনি যে কারণে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত তিনজন থাকে। নির্জন কোনো স্থানে কাউকে পেলে একজন এসে প্রথমে তার সামনে দাঁড়ায়, দু-একটা কথা বলে তার পারিপার্শ্বকতা জানার চেষ্টা করে, এরই মধ্যে আশপাশে লুকিয়ে থাকা বাকি দুজন পেছন থেকে এসে লোকটাকে প্রায় ঘিরে ফেলে।' বিজ্ঞের মতো একটা হাসি দিয়ে আমি সামনে দাঁড়ানো ছেলেটাকে বললাম, 'আমার মাথার পাশ দিয়ে পেছনে তাকান, কি, আপনার মতোই দুটো ছেলে এগিয়ে আসছে, না ?'

ছেলেটা আমার পেছনে তাকিয়েই মাথাটা নিচু করে ফেলল। এরই মধ্যে ছেলে দুটো আমার ঠিক পেছনে এসে আমার সামনের ছেলেটাকে উদ্দেশ করে কিছুটা রাগী গলায় বলল, 'কিরে পলক, কী হয়েছে রে?'

পলক কিছু বলার আগেই আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলে দুটোকে দেখলাম। দুজনই পলকের বয়সী। গলাটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে আমি বললাম, 'এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি, তবে হতে পারত।'

'হতে পারত মানে?' দু জনের একজন বেশ রেগে গেল।

খুব ঠাণ্ডা চোখে আমি ছেলেটার দিকে তাকালাম, কিন্তু কিছু বললাম না। ঘুরে দাঁড়িয়ে পলকের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কি, আমার কথা ঠিক আছে?'

'কি ঠিক আছে?' পেছনের একটা ছেলে দ্রুত আমার সামনে চলে এলো, কিন্তু আরেকজন আমার পেছনেই রয়ে গেল।।

'একটা গল্প বলছিলাম পলককে, পুরাতন গল্প।'

ছেলেটা আগের মতোই গলার স্বরে বলল, 'কিসের গল্প?'

'আপনাদের গল্প।'

'আমাদের আবার গল্প কিসের?' ছেলেটা এবার পলকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই, এসব কী বলছেরে ?'

'কিছু না। তুই যা, আমি দেখছি।'

'আমি যাব কেন?'

'রিছিল—।' পলক রাগী স্বরে কথাটা বলেই গলাটা নরম করে বলল, 'তুই যা, আমি তোকে পরে ঘটনা বলছি।'

রিছিল তবু দাঁড়িয়ে রইল। আমি রিছিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসি হাসি মুখে বললাম, 'আপনার নাম রিছিল, আমি দন্ত্যন।' পলকের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ও পলক, আপনি ?' পেছনের ছেলেটার দিকে হাত বাড়ালাম আমি। রিছিলের মতোই ছেলেটা আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, 'আমি বিপ্লব।'

রিছিলের হাতটা আবার চেপে ধরে আমি বললাম, 'আজ রাতটা আপনাদের সময় হবে ?'

'কেন ?'

'চলুন, আমরা আজ সারারাত হাঁটব আর গল্প করব। আপনি আপনার গল্প বলবেন, আমি আমার গল্প বলব, পলক পলকের গল্প বলবে, বিপ্লব বিপ্লবের গল্প। চাঁদটা ঢেকে আছে, একটু পর জ্যোৎস্নাভরা সে চাঁদটা আবার ভেসে উঠবে, আমরা তাকে সাক্ষী রেখে আমাদের দুঃখের কথাগুলো বলব। স্রষ্টা বসে আছেন চাঁদের ওই আশেপাশেই, চাঁদ মামা আমাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে আমাদের দুঃখের কথাগুলো

একসময় জানিয়ে দেবে স্রষ্টাকে। আর স্রষ্টা যদি একবার আমাদের কষ্টের কথাগুলো জানতে পারেন, তাহলে আমাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। দেখেন, আমি দিব্যি বলছি একদম থাকবে না।'

রিছিলের চোখ দুটো চকচক করছে। আমি ওর একটা কাঁধ চেপে ধরে বললাম, 'কিছু বলবেন ?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রিছিল বলল, 'না।'

সরাসরি রিছিলের চোখের দিকে তাকালাম আমি, 'আপনারা হয়তো কোনো একটা অন্যায় করার জন্য এই রাস্তায় নেমেছেন, খুব সামান্য কিছু পেতে পারেন তাতে। কিন্তু সকাল থেকে এরই মধ্যে আমাদের দেশে ঘটে গেছে অনেক অন্যায়। রাষ্ট্রের ভাণ্ডার থেকে চুরি হয়ে গেছে কয়েক কোটি টাকা, ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত করা আরো কয়েক কোটি টাকা, সম্পদ পাচার হয়েছে, লুণ্ঠন করা হয়েছে, দখল করা হয়ে পতিত জমি। আরো শুনবেন ?'

আগের মতো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে রিছিল, 'না, আমরা জানি।'

'আপনারা জানেন, আমি জানি, অনেকে জানে। কিন্তু তবু প্রতিদিন একই অন্যায়গুলো ঘটে যাচ্ছে। কিছুই বলছি না আমরা।'

'বলে কী হবে ?' পলক বেশ অভিমানী গলায় কথাটা বলে।

'আজ হবে না, কাল হবে না, কিন্তু পরশু ঠিকই হবে।'

চাঁদটা মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছে। বিপ্লব হঠাৎ সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'চারিদিকে এত অন্যায়— তারপরও চাঁদ আমাদের আলো দেয়, গাছ আমাদের ছায়া দেয়, প্রতিদিন গোলাপ ফোটে, নদী বয়ে যায় অবিরত।'

'তারপর ?' আমি বিপ্লবের দিকে তাকাই। বিপ্লব কিছু বলে না। কেউই কিছু বলে না। রূপকথার গল্পের মতো মুগ্ধকরা গল্প বলতে বলতে আমরা হাঁটতে থাকি। আমাদের হেঁটে বেড়ানো আর শেষ হয় না। এক সময় আমরা লক্ষ করি— আমরা হাঁটছি, চাঁদ হাঁটছে, সমস্ত পৃথিবী হাঁটছে। আমরা সবাই এক সঙ্গে হাঁটছি।

জ্যোৎস্না-ধোয়া এ পথ ধরে হাঁটতে আমাদের কোনো ক্লান্তি লাগে না।

কাল সারা রাত আমি ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। রিছিলরা চলে যাওয়ার পর কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায় বুকের ভেতরটা, হু-হু করা ফাঁকা। কোথাও যেতেও ইচ্ছে করে না, হাঁটতে ইচ্ছে করে না, এমন কি কোনো কিছু ভাবতেও ইচ্ছে করে না তখন। কেবল চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে অনেকক্ষণ। বেশ কিছুক্ষণ পর খেয়াল করি ভীষণ কথা বলতে ইচ্ছে করছে আমার, সে যে কারো সঙ্গে, কিংবা গাছ অথবা রাস্তার কুকুরের সঙ্গে।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি ঐশ্বরিয়া তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মনটা সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে যায় আমার। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াই। ঠোঁটের কোনায় সম্মোহিত হাসি দেখে আমিও হেসে ফেলি, তারপর বলি, 'আমি দন্ত্যন, আপনি ?'

মুক্তো ঝরে পরার মতো টুংটাং করে ঐশ্বরিয়া বলে, 'আমি ?'

'হ্যাঁ আপনি ?'

'আমি—।'

কথাটা শেষ করতে দেই না তাকে। হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিয়ে বলি, 'আপনাকে আমি চিনি, অনেকেই চেনে, আবার অনেকে চেনেও না। আচ্ছা, আপনি কাকে চেনেন না, যাকে আপনার চিনতে ইচ্ছে করে ?'

গলা কিছুটা খাদে নামিয়ে ছোট্ট করে উত্তর দেয় ঐশ্বরিয়া, 'নিজেকে।'

'নিজেকে!'

'হ্যাঁ নিজেকে।'

'নিজেকে আবার চিনতে হয় নাকি ?'

'হয় এবং সেটাই প্রথম চিনতে হয়।'

'নিজেকে চিনতে পারেননি ?'

কথাটা উত্তর দেয় না ঐশ্বরিয়া। ছলছল করে তাকিয়ে থাকে কেবল আর সেভাবেই কী যেন ভাবে।

'আপনাকে অনেকেই খুব সুন্দরী বলে, জানেন ?'

'জানি।'

'আবার ঈর্ষাও করে।'

'সেটাও জানি।'

'কেন করে?'

'তাতো জানি না।' ঠোঁটের কোনায় এক টুকরো দুষ্টু হাসি এনে ঐশ্বরিয়া বলে, 'কেন?'

'অসফল মানুষকে কেউ ঈর্ষা করে না।'

'আমি কি সফল?'

'নয়তো কী?'

ঐশ্বরিয়া আবার হেসে ওঠে। এ হাসিটা আমার কাছে ঠিক আনন্দের হাসি মনে হয় না, কেমন যেন এক টুকরো বেদনা মিশে আছে তাতে। বেদনাময় হাসি মুখেই ঐশ্বরিয়া বলে, 'আচ্ছা বলুন তো, ঈর্ষা পাওয়া ভালো, না করুণা পাওয়া?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'বুঝতে পারি না।'

'মানুষ কেবল তাকেই করুণা করে যে মানুষটির অন্য কাউকে করুণা করার ক্ষমতা নেই। আপনার অন্য মানুষকে করুণা করার ক্ষমতা আছে।'

'আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার আশপাশের অনেক মানুষই আপনার করুণা প্রত্যাশী।'

'আমি জানি।' কেমন যেন কান্নার মতো শোনায় ঐশ্বরিয়ার গলাটা, 'কিন্তু তারা জানে না কখনো কখনো আমারও খুব করুণা পেতে ইচ্ছে করে, নিজেকে কারো অধীনে সমর্পিত করে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে আস্তে আস্তে জমে ওঠা বুকের ভেতরের জটগুলো কেউ একজন দেখুক এবং খুলে দিক তা পরম মমতা নিয়ে।'

কিছুটা চমকে উঠি আমি। বলে কী মেয়েটা! ভালো করে তাকিয়ে দেখি ওর বড় বড় চোখ দুটো কেমন যেন ভিজে গেছে। এ মুহূর্তে ওর সম্মোহিত হাসিটা আসলে হাসি মনে হয় না, মনে হয় কান্নার প্রাথমিক রূপ। আমার গলাটাও ভিজে আসে, 'বুকের জটগুলো একা একা খোলা যায় না?'

'চেষ্টা করেছি, পারিনি।'

'কেউ কেউ পারে।'

'হ্যাঁ, তাদের সংখ্যা খুব কম।'

'আচ্ছা, হঠাৎ করে বদলে গেলে কেমন হয়?'

বাঁকানো ভ্রু দুটো একটু যেন নেচে ওঠে ঐশ্বরিয়ার। কপালে নেমে আসা চুলগুলো পেছনে টানতে টানতে অবাক স্বরে বলে, 'আমরা তো প্রতিদিনই একটু একটু করে বদলাচ্ছি। কোনো পরিবর্তনই আসলে হঠাৎ হয় না, একটা পরিবর্তনের পেছনে অনেক দিনের ইচ্ছে থাকে, থাকে শ্রম আর আকাঙ্ক্ষা'।

'একটা কথা বলব ?'

'স্পেশাল কিছু ?'

'ঠিক স্পেশাল না...।'

'তো।'

'একটা জিজ্ঞাসা।'

'আমি জানি আপনি কী জিজ্ঞাসা করবেন।'

'জানেন ?'

'হ্যাঁ জানি। অভিষেকের সঙ্গে আমার বিয়ে কবে— এটাই তো ?'

'না।'

'না!' মিষ্টি একটা হাসি দেয় ঐশ্বরিয়া, 'তো ?'

'আপনাকে আসলে কে বেশি ভালোবাসে— সালমান, বিবেক, না অভিষেক ?'

খুব নরম চোখে তাকায় ঐশ্বরিয়া। তারপর মাথাটা নিচু করে ফেলে। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে থেকে মাথাটা উঁচু করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'জানি না।'

'সত্যি জানেন না ?'

'না। অনেকেই বলেন— ভালোবাসা জানার জন্য একটু সময়ই যথেষ্ট। আমার মনে হয়-না, অনেক সময়ের প্রয়োজন, কিছুটা কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এত সময় কই, কোথায় আমাদের ভালোবাসাবাসির মুহূর্ত ?'

'জানেন, অনেকদিন আগে কোথায় যেন একটা লেখা পড়েছিলাম-ভালোবাসার ব্যাপারে পুরুষরা চিরকালই শিকার; আর মেয়েরা শিকারি। একজন শিকারি যেমন শিকারের জন্য তার বন্দুক ভালোবাসে; একজন মেয়েও তেমনি সৃষ্টির প্রয়োজনে পুরুষকে ভালোবাসে।'

'কথাটা কে বলেছিলেন ?'

'মনে পড়ছে না।'

'সম্ভবত একজন পুরুষ মানুষ বলেছিলেন।'

'এ কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন ?'

'পুরুষরা চিরকালই এভাবে কথা বলে এসেছে। স্বার্থে আঘাত লাগলেই তারা তখন সত্যিকারের পুরুষ হয়ে যায়— সে ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে, এমন কি একান্ত ব্যক্তিগততেও।'

'পুরুষদের প্রতি আপনার অনেক রাগ, না ?'

'না, আমার বাবাও তো একজন পুরুষ।' মাথাটা আবার নিচু করে ফেলল ঐশ্বরিয়া।

'স্যরি, মন খারাপ হয়ে গেল না ?' আমি একটু হাসার চেষ্টা করি, 'আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

'একটা ব্যাপার আমি কখনোই বুঝে উঠতে পারিনি-যার সঙ্গেই আমার একটু ইনটিমিসি গড়ে ওঠে মানুষজন তার সঙ্গেই আমার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।' হাসতে থাকে ঐশ্বরিয়া।

'কারণ আছে।'

'কারণ আছে!'

'জি। হয়তো বন্ধনেই মানুষ তার সুখ খুঁজে পায়।'

'তার মানে আমাদের সম্পর্ক, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের চাওয়াগুলো এতই ঠুনকো যে, বন্ধন ছাড়া সেগুলো টিকে থাকে না মোটেই ?'

'হয়তো।'

বুকের ভেতরের একটা দীর্ঘশ্বাস লুকানোর চেষ্টা করল ঐশ্বরিয়ার, 'এ বন্ধনও তো এক সময় ছিঁড়ে যেতে পারে।'

'পারে।'

'তাহলে কি দরকার এসবের, এ আয়োজনের, সানাই বাজানোর, রং-চং মেখে পুতুল হয়ে বসে থাকার ?' এবার সত্যি সত্যি একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বের হয়ে ঐশ্বরিয়ার বুকের ভেতর থেকে।

'কখনো খুব একা থেকেছেন ?'

কথাটার উত্তর দেয় না ঐশ্বরিয়া। নির্জীব হয়ে থাকা শহরটা আবার চঞ্চল হতে শুরু করেছে। নাগরিকতায় দখল হওয়া এ শহরে এখনো কিছু কিছু পাখি ডাকছে, কোনো ঘাসফুল শিশির মেখে অপেক্ষা করছে কাউকে অবাক করে দেওয়ার জন্য, রাচ্চার নেড়ী কুকুরগুলো ঘুম ভেঙে এখানে ওখানে দৌড়াচ্ছে খাবারের সন্ধানে, সঙ্গে সভ্য দাবি করা মানুষগুলোও।

পুবের আকাশটা লাল হয়ে উঠছে— আগুনরঙা লাল। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি ঐশ্বরিয়ার দিকে তাকাই। তার আনত দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'অনেকদিন এমন সূর্যোদয় দেখি না।'

'আমিও না।'

তারপর আর কোনো কথা বলে না ঐশ্বরিয়া। চুপচাপ চেয়ে থাকে সে আমার দিকে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির পণ্যের সাথে সেও ভেসে আছে সামনের

সাইনবোর্ডে। এ মুহূর্তে তাকে সত্যি সত্যি একা মনে হচ্ছে, চাঁদ-তারা ডুবে যাওয়া ভোরের আকাশের মতোই একা।

সাত্তার ভাই আমাকে দেখে প্রথমে কিছুটা লাফিয়ে উঠলেন। তারপর আমার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনি কেমন মানুষ ভাই, বলেন তো! সেই যে গেলেন আর দেখা নাই। আমার কাছে আপনার একটা মোবাইল আছে, আমার নিজের একটা মোবাইল আছে, দুটোর নাম্বারই আপনাকে দিয়েছি আমি। একটা বারের জন্যও তো ফোন করতে পারতেন।'

'তা পারতাম।' সাত্তার ভাইয়ের হাতটা আমি চেপে ধরি এবার।

'এদিকে আমার হয়েছে জ্বালা। আপনার ভাবির কাছে আপনার কথা বলতেই সে একেবারে রেগে-মেগে অস্থির।'

'কেন!'

'মেয়েমানুষ বোঝেন তো। আপনার বয়সী একটা ছেলে না খেয়ে থাকে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়— এ কথা শুনেই দেখি চোখে পানি-টানি এনে একাকার। তার এক কথা আপনাকে কেন আমি বাসায় নিয়ে গেলাম না? আপনার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ধরে বাসায় নিয়ে যাই, না হলে...।'

'না হলে?'

'সেটা আপনি বুঝবেন না ভাই। সংসার তো শুরু করেন নাই, করলে বুঝবেন।'

'ভাবির কথা শুনে কেমন যেন লাগছে।'

'ভালো কথা, আপনি আপনার মোবাইলের নম্বরটা কাকে দিয়েছেন বলেন তো?'

'কাকে দিয়েছি?'

'মনে করে দেখুন।'

'ও, একটা মেয়েকে দিয়েছি।'

'তার নাম চৈতী, না?'

'হ্যাঁ, ও ফোন করেছিল নাকি আপনাকে?'

'করেছিল মানে...।'

কথাটা শেষ করার আগেই আমি বলি, 'কখন করেছিল?'

'কখন টখন না, সম্ভবত যখন সুযোগ পায় তখনই করে।'

'কী বলে?'

'কী আর বলে— আপনাকে নাকি তার ভীষণ দরকার। এটা নিয়ে আরেক কেলেংকারী ভাই! ঘুমিয়ে পরার পর প্রায় রাতেই ফোন করে মেয়েটা। আপনার ভাবি বিরক্ত হয়ে বলে, কে ফোন করেছিল? কী জবাব দেব বলুন তো, মেয়েটাকে আমি

চিনি নাকি। একদিন আপনার ভাবি ফোনটা হঠাৎ রিসিভ করে ফেলে, তারপর থেকে দু'দিন আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। শেষে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে তবে রক্ষা।'

'গত রাতে ফোন করেছিল ?'

'না। আমি তাকে বলেছি আর ফোন করার দরকার নাই।' সাত্তার ভাই মোবাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দন্ত্যন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব।'

'চৈতীর ফোন নম্বর আছে নাকি আপনার কাছে ?'

'হ্যাঁ, আমাকে ফোন করে না, সেই নম্বরটাই সেভ করে রেখেছি। ফোন করবেন এখন ?'

'এখন না, পরে করি।'

'নাস্তা নিশ্চয় করা হয়নি,' সাত্তার ভাই তার পাশের চেয়ারে আমাকে বসিয়ে একটা ছেলেকে ডাক দেন, 'বক্কার, এদিকে আয়।' বক্কার কাছে এসে দাঁড়াতেই সাত্তার ভাই বললেন, 'এখানে নাস্তা দে।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'কী নাস্তা দিবি ?'

বক্কার কিছুটা ভয় ভয় গলায় বলল, 'কী নাস্তা দিমু ?'

সাত্তার ভাই একটু ভেবে বললেন, 'তিনটা কড়া পরোটা দে, ভাজি দে, একটা ডিম দে। দন্ত্যন ভাই, ডিম মামলেট খাবেন না পোচ খাবেন ?'

'একটা হলেই হয়।'

সাত্তার ভাই বক্কারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশি করে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে একটা ডিম মামলেট নিয়ে আয়। গ্লাস ধুয়ে পানি দিস। আর শোন, খাওয়ার শেষে এক মগ কফি দিবি।'

বক্কার চলে যেতেই সাত্তার ভাই আমাকে বললেন, 'নাচ্চা করা শেষ হলেই বাসায় নিয়ে যাব আপনাকে। তার আগে আপনাকে একটা কথা বলব। কথাটা একটু গোপন।'

'বলুন।'

'একটু লজ্জা লাগছে কথাটা বলতে।'

'লজ্জা লাগলে পরে বলবেন।'

সাত্তার ভাই কী একটা ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে, বাসায় গিয়ে এক ফাঁকে কথাটা বলব আপনাকে। তারপর আরেকটা কথা বলব।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'ঠিক আছে, সে কথাটাও শুনব।'

কলবেল বাজার বেশ কিছুক্ষণ পর একটা মেয়ে এসে বাইরের গেটটা খুলে দিল। গেট খুলতে দেরি হওয়ার জন্য সাত্তার ভাই বেশ রেগে ছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু

মেয়েটাকে দেখেই মুখটা হাসি হাসি করে ফেললেন তিনি। তারপর আমাকে দেখিয়ে খুব মিহি গলায় বললেন, 'কবিতা, এ হচ্ছে-।'

কবিতা নিজের ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ করতে বললেন সাত্তার ভাইকে। সাত্তার ভাই সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, 'কী হয়েছে, কোনো সমস্যা ?'

মাথা উঁচু নিচু করতে করতে কবিতা কিছুটা ফিসফিস করে বলল, 'আপার মাথা গরম হয়ে গেছে।'

চোখ দুটো আগের মতোই বড় বড় করে সাত্তার ভাই বললেন, 'খুব বেশি হয়ে গেছে ?'

'হ খুব। আপনি পোড়া বেগুন ভর্তা খেতে পছন্দ করেন না, আপনি যদি এখন আপার মাথার ওপর আস্ত একটা বেগুন রাখেন সঙ্গে সঙ্গে সেটা পুড়ে সিদ্ধ হয়ে যাবে। রাখবেন নাকি দুলাভাই?'

'ব্যাপার কী ?'

'ব্যাপার আগেরটাই।'

'আগেরটাই মানে ?'

'নিলয় ফেল করেছে।'

'আবারও!'

কবিতা মুখটা বাঁকা করে বলল, 'হ, আবারও।'

'ওকে না দুইটা মাস্টার রেখে দিলাম!'

'দুইটা কেন দুলাভাই, ওকে একশটা মাস্টার শিল পাটা দিয়ে বেটে খাওয়ালেও ও পাশ করতে পারবে না।'

সাত্তার ভাই চেহারাটা হতাশ করে বললেন, 'আমার আর কী করার আছে বলো তো ?'

'আপাতত ওকে কিছু করার নেই, আপনি এখন আপার মাথা ঠাণ্ডা করেন। এরই মধ্যে দুইটা কাচের গ্লাস আর একটা প্লেট ভাঙ্গা হয়ে গেছে।'

'নিলয়কে মেরেছে নাকি ?'

'আবার জিগায়!' কবিতা হাসতে হাসতে বলে, 'আধা ঘণ্টা পেটার পর ওকে এখন বাথরুমে আটকে রেখেছে।'

'সর্বনাশ! বলো কী!'

'প্লিজ দুলাভাই, বাসায় ঢুকেই নিলয়কে বাথরুম থেকে বের করতে যাবেন না, আপা তাহলে আপনাকেও আটকে রাখবে কিন্তু।'

'তুমি কিছু বলোনি ?'

'বলেছি এবং করার চেষ্টাও করেছি। আপা আমাকে শেষবারের মতো বলেছে, আমি যদি আর একবার নিলয়কে বাঁচানোর চেষ্টা করি তাহলে আমাকেও বাথরুমে আটকে রাখবে এবং কমোডের পানি খাওয়াবে।'

'আমি তাহলে যাই, এখন আর বাসায় ঢোকার দরকার নেই।'

কবিতা সাত্তার ভাইকে বাধা দিয়ে বলল, 'কোথায় যাবেন আপনি ? আপা তো কলিং বেলের শব্দ শুনেছে, আমি যে গেট খুলতে এসেছি সেটাও দেখেছে। আপা যদি জিজ্ঞেস করে কে এসেছিল, কী বলব তখন ?'

'বলবে কুকুর এসেছিল।'

'আপনার মাথা ঠিক আছে তো দুলাভাই ?'

'স্যরি, বলবে ফকির এসেছিল।'

'আপা তখন বলবে এতক্ষণ ফকিরের সঙ্গে কী কথা বললি ?'

'মুশকিল।'

'কোনো মুশকিল টুশকিল নাই, আপনি বাসায় চলেন। তার আগে একটা কথা—।' কবিতা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার যদি ভুল না হয় আপনি দন্ত্যন, আই মিন দন্ত্যন রুহমান।'

'জি।'

'আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনাকে আমি চিনলাম কীভাবে। তার আগে আরেকটা কথা-আমি কবিতা, মানে আমার নাম কবিতা আর এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন—।' সাত্তার ভাইকে দেখিয়ে কবিতা বলল, 'ইনি হচ্ছেন আমার দুলাভাই আর আমি তার—।'

'শ্যালিকা।'

'আপনার মাথায় তো অনেক বুদ্ধি। যাক, বুদ্ধির পরীক্ষা অন্য সময় করা যাবে। তার আগে বলি আপনাকে চিনলাম কীভাবে। দুলাভাই আপনার কথা আর আপনার বর্ণনা এতবার বলেছেন বা দিয়েছেন, আপনাকে দেখেই আমি চিনে ফেলেছি। আর আপা তো মনে হয় মুখস্থই করে ফেলেছে আপনাকে। আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে, তার আগে চলুন ঘরে ঢোকা যাক।'

সাত্তার ভাইয়ের বাসায় ঢুকেই চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল আমার। সাত্তার ভাই এটা কী বানিয়েছে! একেবারে রাজবাড়ির মতো দেখতে সব কিছু। জিনিসপত্রগুলো এমনভাবে সাজানো গুছানো, একেবারে ছবির মতো।

আমাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে সাত্তার ভাই ভেতরের ঘরে গেলেন। সম্ভবত সাত্তার ভাইয়ের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললেন, 'তুমি এ সময় বাসায় কেন ?'

সাত্তার ভাই কিছুটা মোসাহেবী গলায় বললেন, 'কেন, এ সময় আমি বাসায় থাকতে পারি না ?'

'না, তোমার তো এখন হোটেলে থাকার কথা। ঠিক আছে, এ সময়ে এসে ভালোই করেছ। তোমার গুণধর ছেলের কথা শুনেছ ?'

'কেন, কী হয়েছে নিলয়ের ?'

'কবিতা কিছু বলে নাই।'

'কই, তেমন তো কিছু বলল না।'

'তোমার ছেলে এবারও ফেল করেছে। অঙ্কে ও এবার কত পেয়েছে জানো ?'

'কত ?'

'উনিশ।'

'বলো কী ?'

'ইংরেজির খবর জানো ?'

'না, বলো ?'

'ইংরেজিতে পেয়েছে আট।

'দু দুটো মাষ্টার দিলাম, তারপরও যদি এ অবস্থা হয় তাহলে আমার কী করার আছে বলো ?'

'শুধু মাস্টার দিলেই হয় ? মাস্টার চলে যাওয়ার পর ও একমুহূর্ত পড়ে ? সারাক্ষণ শুধু দুষ্টুমি আর দুষ্টুমি।'

'আমি তো বাসায় থাকিই না।'

'তোমার তো এক কথা— বাসায় থাকো না তো কি হয়েছে, যতক্ষণ বাসায় থাকো ততক্ষণই বা কী ঘোড়ার ডিম করো! আদর করতে করতে তো ছেলেকে বান্দর বানায়া মাথায় তুলছ। তোমার জন্য একটুও শাসন করা যায় না ওকে।'

'ঠিক, সবাইকে শাসন করা তোমার জন্য একটু কঠিনই হয়ে পড়েছে।'

'সবাইকে মানে ?'

সাত্তার ভাই আমতা আমতা করে বললেন, 'সবাইকে মানে আমাকে, কবিতাকে, নিলয়কে...।'

সাত্তার ভাইয়ের স্ত্রী চিৎকার করে বলেন, 'তোমাদের সবাইকে যদি শাসন না করতাম তাহলে এতদিন ভেসে যেতে।'

'ঠিক।'

'আমি আছি বলেই তোমার সংসারটা এখনো টিকে আছে।'

'ঠিক।'

'আর শোনো, আমাকে অত বোকা ভেবো না, তোমরা আসলে যা করো তার সবই কিন্তু আমি বুঝি।'

'ঠিক।'

'কী ঠিক ঠিক করছ, যাও, তোমার ছেলেকে বাথরুমে আটকে রেখেছি, ওকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানে রেখে আসো। ওকে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করো।'

'ওকে কোথায় রেখে আসব ?'

'কোথাও রেখে আসতে হবে না, মাটি খুঁড়ে কবর দিয়ে আসো।'

'ঠিক আছে, একটা কোদাল দাও।'

'কোদাল দিয়ে কী হবে ?'

সাত্তার ভাই কাতর গলায় বললেন, 'মাটি খুঁড়তে হবে না ?'

সাত্তার ভাইয়ের স্ত্রী তারপর কী যেন বললেন, শুনতে পেলাম না এ ঘর থেকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে ভেতরের ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই দরজাটা খুলে গেল। মনু আপার বয়সী একটা মেয়ে ড্রইংরুমে ঢুকে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি তার অনেকদিনের চেনা। একটু পর মেয়েটি এগিয়ে এসে কোনো রকম দ্বিধা বা সংকোচ না করে আমার একটা হাত ধরে বলল, 'কাল রাতে খেয়েছ ?'

বেশ অবাক হয়ে আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। কপালে লম্বা একটা টিপ, ভ্রু দুটো সুন্দর করে বাঁকানো, কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো চুল আর সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে— পান খাওয়া টকটকে লাল ঠোঁট। আমি মুখটা হাসি হাসি করে বললাম, 'আপনি ভাবি ?'

ছলছল চোখে ভেজা ভেজা গলায় মেয়েটি বলল, 'না, আপা।'

সাত্তার ভাইয়ের বৌ সেদিন থেকে আমার আপা, শেপু আপা। আর দেড় মাস ধরে আমি আমার এই নতুন আপার বাসায় আছি। এ দেড় মাসে আমি কোথাও যাইনি, রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিওনি। অনেক কিছু হয়েছে এ সময়টাতে— সাত্তার ভাই এখন দুলাভাই, আপা আমাকে সম্বোধন করে তুই, আমি করি তুমি, নিলয় আমাকে ডাকে মামা, কেবল কবিতা আছে আগের মতোই। দুজন দুজনকে আপনি আপনি করে বলি আর সুযোগ পেলেই সে আমাকে প্রচ্ছন্ন একটা অপমান করার চেষ্টা করে, আমি তার সে চেষ্টা দেখে হাসি।

ভার্সিটিতে পড়া এ মেয়েটা আমাকে একদিন বলে, 'আপনি নিজেকে কী মনে করেন ?'

'মানুষ, ক্ষুদ্র মানুষ।'

'কিন্তু আপনার আচরণ তো মনে হয় আপনি পৌরাণিক কোনো দেবতা— ভোগে, ত্যাগে, সুখে ভালোই আছেন।'

'আপনার তাই মনে হয়?'

'আপনার মনে হয় না ?'

'নাহ্।' কবিতার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আমি বলি, 'এ কয়দিনে আমি একটা জিনিস শিখেছি। প্রতিটি মানুষের ভেতরেই অন্য আরেকটা মানুষ বাস করে। কিন্তু সে মানুষটাকে কেউ সহজে দেখাতে চায় না। এই যে আপনি ভার্সিটিতে পড়েন, এ দেশের কয়জন মেয়ের ভার্সিটিতে পড়ার ভাগ্য হয় বলুন ? ইকোনোমিক্সের মতো ভালো একটা সাবজেক্টে পড়ছেন আপনি, শামুন্নাহার কিংবা রোকেয়া হলে না থেকে আপনার দুলাভাইয়ের বাসায় থাকছেন, নিজেকে একটা কাঠিন্যের আড়ালে রেখেছেন, কিন্তু আমি তো জানি আপনি নরম মনের একজন মানুষ।'

কবিতা কিছুটা অবাক চোখে আমারে দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি জানেন আমি নরম মনের মানুষ ?'

'হ্যাঁ জানি।'

'কীভাবে ?'

'সেটা বলা যাবে না, হয়তো কোনো দিন বলাও হবে না।'

বিকেলে কবিতা আমার ঘরে এসেছিল। আমার অবাক হওয়ার দরকার ছিল এতে, কারণ এতদিন ধরে এ বাড়িতে আছি কিন্তু কবিতা কোনো দিন আমার ঘরে আসেনি। আজ ঘরে ঢুকেই ও বলেছিল, 'আজ আপনাকে একটা কথা বলব।'

হাসতে হাসতে আসি কবিতাকে বললাম, 'সেটা কি আগের মতোই আমার জন্য অপমানজনক ?'

'আমি আপনাকে এতদিন খুব অপমান করেছি, না ?'

'আপনি করেছেন, কিন্তু আমি হইনি।' শব্দ করে হেসে উঠি আমি। 'কিন্তু আপনি আজ অন্যরকম একটা কথা বলতে এসেছেন, আমি জানি। আমাকে একটা থ্যাংক্স দিতে এসেছেন, না ?'

মাথাটা উঁচু নিচু করল কবিতা।

'আপনার আগেই আপা এসে থ্যাংকসটা দিয়ে গেছে। এ বাসায় প্রথমে ঢুকেই আমি নিলয়ের ব্যাপারটা জেনেছি। আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম— এ ছোট্ট ছেলেটাকে আমি ভালো করেই ছাড়ব। মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়ে, কতইবা বুদ্ধি ওর।'

'কিন্তু আপনি এ পদ্ধতিটা কোথায় পেলেন ?'

'আমার বাবা প্রায়ই একটা কথা বলেন— মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের ভেতর একটা অপরাধবোধ আছে। নিলয়কে সবসময় বকাঝকা করা হতো, আপাকে ম্যানেজ করে আমি সেটা বন্ধ করলাম, তারপর ওকে ওর মতো করে চলতে দিলাম। একদিন যায়, দু'দিন যায়, নিলয় দেখে তাকে তো কেউ

কিছু বলছে না, পড়তে না বসলে বকাঝকা করছে না, বরং যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে, ওর পছন্দ মতো খেতে পাচ্ছে। মাত্র কদিন পর হঠাৎ তার ভেতর বোধ জেগে ওঠে সে অপরাধ করছে, অন্যায় করছে। পরিবর্তিত হতে থাকে সে তখন থেকেই। জানেন, স্কুলে থেকে বাসায় ফিরেই নিলয় আজ রেজাল্টটা নিয়ে সরাসরি আমার সামনে এসে বলে, মামা, অনেক ভালো রেজাল্ট করেছি আমি, এই দেখো, আমার মার্কসিট দেখো। আমি দেখছি নিলয় কথাটা বলছে আর চোখ ছলছল করছে। আপনি লিখে রাখেন, ও আরো ভালো রেজাল্ট করবে, ও ফার্স্ট হবে।'

'আপনার তাই মনে হয় ?'

'আমার তাই মনে হয় না, আমি ওর চোখ দেখেছি।'

কবিতা কী একটা বলতে নেয় কিন্তু বলতে পারে না। আমি ওর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, 'কাল আমি চলে যাচ্ছি।'

কিছুটা চমকে উঠে কবিতা বলে, 'কোথায় ?'

'মায়ের কাছে।'

'অ।' ছোট্ট করে কথাটা বলে কবিতা চলে যেতে নেয় এ ঘর থেকে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই ঘুরে দাঁড়ায় আবার। একটু সময় নিয়ে গাঢ় স্বরে বলে, 'আবার কবে আসবেন ?'

'আসব।'

'কবে ?' উদ্বিগ্ন শোনায় কবিতার গলা।

'তা তো জানি না।' উদাস কণ্ঠে কথাটা বলে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই, সন্ধ্যার আকাশটা ক্রমেই তারায় তারায় ভরে যাচ্ছে। কে জানে— এই তারাদের ভেতরেই হয়তো কোথাও আমার আসল ঠিকানা লুকিয়ে আছে।

শব্দটা মাত্র একবার আমার কানে এসেছে— 'এচ এচছির ফল।' সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম আমি। একটা ছেলে বেশ কয়েকটা কাগজ হাতে নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে আর বলছে, 'এচ এচছির ফল মাত্র দুই ট্যাকা, এচ এচছির ফল মাত্র দুই ট্যাকা।'

বুকের ভেতর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আমার। নিজেকে কখনো অসহায় মনে হয়নি, কিন্তু এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে। এইচএসসির রেজাল্ট মানে মিতির রেজাল্ট বের হয়েছে আজ।

সাত্তার ভাইয়ের বাসা থেকে বের হয়ে এসেছি সেই সকালে, কাউকে না বলে, চুপিচুপি। কেবল কবিতা জানে। সাত্তার ভাই কিংবা শেপু আপা জানলে আমাকে আসতে দিত না, অন্তত থাকতে হতো আরো ক'টা দিন। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বাসস্ট্যান্ডে এসেই খবরটা শুনলাম। বাসার সবাই হয়তো এই মধ্যে রেজাল্টটা জেনেও গেছে, কিন্তু আমি এখনো কিছু জানি না। বুকের ভেতর সত্যি সত্যি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছি এরই মধ্যে অর্ধেকের বেশি ফাঁকাও হয়ে গেছে।

যদিও মিতির রোল নম্বর আমি জানি না, তবু খুব ইচ্ছে হচ্ছে দু'টাকা দিয়ে রেজাল্টের একটা কাগজ কিনি। কিন্তু এটা তো জানি আমার পকেটে কোনো টাকা নেই, একটি টাকাও নেই। অভ্যাসবশত তবু প্যান্টের সামনের পকেটে হাত ঢুকালাম। একটা কাগজের সঙ্গে হাতটা লাগতেই বের করে ফেললাম সেটা। ভাঁজ করা কাগজ, সম্ভবত একটা চিঠি। কাগজটা খুলে ফেললাম আমি। হ্যাঁ, একটা চিঠি। দ্রুত চিঠিটার নিচের দিকে তাকাতেই শেপু আপার নামটা দেখতে পেলাম।

প্রিয় দন্ত্যন

আমি জানতাম একদিন তুই চুপচাপ এভাবে চলে যাবি। যাবিই তো, আমি তো আর তোর মনু আপার মতো আপন বোন নই। যাক গে, তোকে কিছু জিনিস দিয়েছি আমি, তোর মানিব্যাগে আছে সেগুলো। ইচ্ছে হলে জিনিসগুলো তুই খরচ করতে পারিস, কিংবা কাউকে দিয়ে দিতে পারিস অথবা ফেলেও দিতে পারিস কোথাও। সবকিছুই হবে তোর মতো।

ভালো থাকিস। অ ভালো কথা— কতটুকু ভালোবাসলে একজন আপন বোনের মতো হওয়া যায় রে?

তোর শেপু আপা

হৃদয়ের একেবারে কাছাকাছি একটা ধাক্কা লাগল এবং সেই ধাক্কাটাই দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। এ মুহূর্তে নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হচ্ছে আমার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, চারদিকে শূন্যতার ছড়াছড়ি, এতসব শব্দের মাঝেও নিঃসীম নিঃশব্দতা।

পেছনের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করলাম, তারপর সেটা খুলতেই বেশ কয়েকটা পাঁচশ' টাকার নোট দেখতে পেলাম আমি।

সন্ধ্যা নামছে। কী একটা পাখির ডাকে আকাশের দিকে তাকাই, একটা না, অনেকগুলো। দলবেঁধে উড়ে যাচ্ছে তারা আবাসে। কতদিন এরকম দলবাঁধা পাখি দেখি না। আমার দৃষ্টিটা পাখিগুলোর পিছু নেয়। জ্বলজ্বলে বিলবোর্ড পাশ কাটিয়ে, কোনো দালানের ছাদে ডিস অ্যান্টিনা ও সম্প্রতি গজে ওঠা মোবাইল কোম্পানিগুলোর টাওয়ার পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায় পাখিগুলো, জীবন থেকে চলে যাওয়া না ফেরা মানুষের মতো।

মাথা নিচু করে চোখ দুটো বন্ধ করি আমি। মিতির মুখটা মনে করার চেষ্টা করি। কিন্তু কেমন যেন মুখটা ভেসে ওঠে না এ মুহূর্তে। তার বদলে ভেসে ওঠে আমার মুখটাই। ক বছর আগে এরকম একটা দিনে বাবা আমার ঘরে এসেছিলেন, এরকম এক সন্ধ্যায়, নিঃশব্দে। চুপচাপ বসে ছিলাম আমি বিছানায়। আমার ঘরের একমাত্র জানালার ওপরের দিকে একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে বাসা করেছে এক চড়ুই দম্পতি, সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আর চড়ুই দম্পতির কথোপকথন শুনছি। বাবা আলতো করে আমার পিঠে হাত রাখতেই কিছুটা চমকে উঠি আমি। বাবা আমার চমকে ওঠা দেখে ম্লান হেসে বলেন, 'কত দিন সূর্যাস্ত দেখিস না বলতো?'

বাবার দিকে তাকিয়ে আমিও ম্লান হাসি, 'সূর্যাস্ত! কংক্রিটে রূপান্তরিত হওয়া এ শহরের বড় বড় দালানের ভিড়ে এখন তো সূর্যকেই দেখা যায় না বাবা।'

মাথা কিছুটা উঁচু নিচু করে বাবা বলেন, 'তা ঠিক। তবে দূরে কোনো ফাঁকা জায়গায় গেলে দেখা যেতে পারে।' বাবা খুব আন্তরিক হয়ে বলেন, 'যাবি নাকি, চল না কোথাও গিয়ে সূর্যাস্ত দেখে আসি।'

'তোমার সূর্যাস্ত দেখতে ইচ্ছে করছে ?'

'না, তোকে দেখাতে ইচ্ছে করছে।'

'কেন ?'

'তেমন কোনো কারণ নেই, তোকে দেখাতে ইচ্ছে হলো, তাই।'

'অন্য একদিন যাব বাবা। সেদিন সূর্য ডুবে যাওয়া দেখতে দেখতে আমি তোমাকে একটা কবিতা শোনাব, তুমি মুগ্ধ হয়ে সে কবিতা শুনবে আর ভাববে— মানুষ আর সূর্য তো একই। সূর্য ডুবে যায় একটু পরেই আবার ওঠার জন্য, মানুষ দুঃখী হয় সে যে সুখী ছিল এবং আবার সুখী হবে তা বোঝার জন্য।'

'আচ্ছা, তুই কখনো সিগারেট খেয়েছিস ?'

কিছুটা লজ্জা পাই আমি। পরক্ষণেই মুখটা হাসি হাসি করে বলি, 'তোমার কী মনে হয় ?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমাকে তুমি বুঝতে পারো না ?'

'না।'

'বাবা হিসেবে তোমার এটা একটা ব্যর্থতা বাবা।'

বাবা হাসতে হাসতে অথচ দুঃখী গলায় বলেন, 'হ্যাঁ, এটা আমার একটা ব্যর্থতা। আরো অনেক ব্যর্থতা আছে আমার, বলতে পারিস আপাদমস্তকে আমি একজন ব্যর্থ মানুষ।'

'তাই ?' বাবার একটা হাত ধরে আমি বলি, 'আমার এ ছোট্ট জীবনের সার্থকতা হচ্ছে এ ব্যর্থ মানুষটিই আমার বাবা। শুধু একবার না, হাজার বার, লক্ষ বার, কোটিবার পুনর্জন্ম হলেও আমি স্রষ্টার কাছে এ ব্যর্থ মানুষটিকেই বাবা বলে চাইব। বাবা-।' বাবার চোখের দিকে তাকাই আমি, 'তুমি তখন আমাকে ছেলে হিসেবে চাইবে তো ?'

বাবা কিছু না বলে চলে যান। আমার প্রচণ্ড হাসি পায় তখন। আমার মন ভালো করতে এসে বাবা নিজেই মনটা খারাপ করে ফেলেন। বাবা আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন, আমি জানি। বাবা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন, 'তোর কি মন খারাপ ?' উত্তরটা না শুনেই বাবা হয়তো আবার বলতেন, 'কী কারণে তুই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দিলি না, সেটা কখনো জানতে চাইনি, জানতে চাইবও না। যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের আজ রেজাল্ট বের হয়েছে। আচ্ছা, তুই কি কোনো অপরাধবোধে ভুগছিস ?'

কতদিন পর কথাটা মনে পড়ল! সেদিন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার রেজাল্টের দিন বাবার মন খারাপ ছিল, আজ কি মনটা ভালো ? বাবা কি আজ হাসছেন ? মিতির রেজাল্ট শুনে তিনি কি আনন্দে পাগল হয়ে গেছেন ? আমি নিশ্চিত জানি বাবা পাগল হয়ে গেছেন এবং তার পাগলামি দেখে আমাদের হাসতে ভুলে যাওয়া মা-ও ছোট খাটো পাগলামি করছে আর হাসছে।

চারদিকে ধারাবাহিক অন্ধকার নামছে। মনটা খারাপ হয়ে যায় হঠাৎ। টুং করে একটা রিকশা এসে দাঁড়ায় সামনে। কিছু না বলেই আমি রিকশায় উঠে পড়ি। একটু পর আকাশে চাঁদ উঠবে, জ্যোৎস্নায় আমাদের উঠোনটা ডুবে যাওয়ার আগেই আমাকে বাড়িতে পৌঁছতে হবে। তারপর বাবাকে দেখাতে হবে— আসল পাগলামি কাহাকে বলে এবং সেটা কত প্রকার।

বাবা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন। বাড়ির গেটটা খুলতেই টের পেলাম সেটা। কিন্তু তার আগেই চোখ দুটো প্রসারিত করে, মুখ লাল লাল করে, বিন্দু বিন্দু জলে নাক ঘামিয়ে, দৌড়ে এসে কিছুটা হাঁপাতে হাঁপাতে মিতি বলল, 'ভাইয়া, তুই এসেছিস!'

হাসতে হাসতে আমি বলি, 'তোর কি মনে হয় আমি আসি নাই ?'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ভাইয়া।'

'আগেই বিশ্বাস করার দরকার নেই। আমার দিকে ভালো করে তাকা, তারপর বল আমি সত্যি সত্যি এসেছি না আমার ভূত এসেছে ?'

কিছুটা ভয় পেয়ে মিতি আমাকে প্রায় খামচে ধরে বলে, 'এটা কী বলছিস ভাইয়া, আমার ভয় করছে কিন্তু।'

আগের মতো হাসতে হাসতে আমি বলি, 'সেই প্রাচীন কাল থেকে তোর ভূতের ভয়, ভয়টা এখনো আছে।' আমি এবার শব্দ করে হেসে উঠি।

মিতি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলে, 'এত হাসছিস যে ?'

'সেই কথাটা তোর মনে আছে ?' মিতির দিকে দুষ্টুমি নিয়ে তাকাই আমি।

মিতি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোন কথাটা ?'

'একদিন ভূত ভূত বলে তোর সে কী চিৎকার! আমরা সবাই দৌড়ে এসে দেখি, তুই আমাদের বড় ঘরের বাঁশের বেড়ার দিকে তাকিয়ে হাত-পা নাচাচ্ছিস আর ভূত ভূত বলছিস। তোর দৃষ্টি অনুসরণ আমরা ভালো করে তাকিয়ে দেখি বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক গুচ্ছ চাঁদের আলো এসেছে আমাদের ঘরে, সেটা দেখতে অবিকল একটা কিম্ভূতকিমাকার মানুষের মতো। তারপর তোর সে কী লজ্জা!'

মিতি কিছুটা গম্ভীর গলায় বলে, 'তুই যদি আজ না আসতি. তাহলে আমি কী করতাম জানিস ?'

'জানি।'

'কী ?'

'সারা রাত ভরে কাঁদতিস।'

'কিন্তু আমার মন বলছিল ভাইয়া তুই আসবি।'

'এবার তোর রেজাল্ট বল ?'

'তুই গেস কর।'

'এ প্লাস।'

'উঁহু, গোল্ডেন এ প্লাস।'

মিতি রেজাল্ট ভালো করবে, কিন্তু এত ভালো! আমার একদম বিশ্বাস হচ্ছে না। গোল্ডেন এ প্লাস পেতে হতে হলে প্রতিটা সাবজেক্টে প্রাইভেট পড়তে হয়, হেঁটে নয় রিকশা অথবা গাড়িতে করে কলেজে পৌঁছে দিতে হয়, গ্লাস ভর্তি দুধ

দিতে হয় সকাল-বিকাল, নিশ্চিন্ত একটা অস্তিত্বে রাখতে হয় তাকে প্রতি মুহূর্ত, রোদে পুড়বে না, বৃষ্টিতে ভিজবে না তার শরীরের একটা অংশও, খাবার হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে কোনো এক আপনজন— তারপরই না এ প্লাস।

অথচ, অথচ সপ্তাহে তিন রাত আমরা না খেয়ে লেখাপড়ার খরচ যোগাই! বাকিগুলো আকাশ ছোঁয়ার মতো। প্রাইভেট টিউটর শব্দটা মিতির কাছে খুবই অপরিচিত, রিকশায় চরার যে কী মজা ভুলে গেছে সে অনেক আগেই, গ্লাস ভর্তি দুধ-তার কাছে অষ্টম আশ্চর্য! রোদে তার শরীর পুড়েছে, বৃষ্টিতে তার মাথার চুল ভিজেছে। চোখ ফেটে জল আসে আমার, আমি সেটা লুকানোর চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। তার আগেই মিতি আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ভাইয়া দেখিস, আমাদের এ জায়গাটায় সত্যি সত্যি একদিন রড-সিমেন্টের বিশাল একটা বিল্ডিং হবে। তারপর বাবা আর মাকে মাঝখানে রেখে আমরা সবাই সে বিল্ডিংয়ের সামনে একটা ছবি তুলব, তারপর বাঁধাই করে আমাদের ড্রইংরুমে রেখে দেব সেটা।' মিতি শব্দ করে কেঁদে উঠে বলে, 'ভাইয়া, বল হবে না, হবে না আমাদের এরকম একটা বিল্ডিং?'

পুরাতন একটা রেডিও আছে আমাদের, মুমূর্ষু। বাবার মন যখন অসম্ভব ভালো থাকে তখন এটা বাজান তিনি। ব্যাটারি প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া মৃত প্রায় রেডিওটায় গান অথবা খবর যাই বাজুক সবকিছুই তখন কান্নার মতো শোনায়, একটা টানা ছিঁচকাঁদুনির মতো। বাবার ঘরের বারান্দায় রেডিওটা এখন কাঁদছে। সে কান্না আর মিতির কান্না একাকার হয়ে বড় অদ্ভুত শোনায়। মুঠো মুঠো জ্যোৎস্নায় ডুবে যাচ্ছে আমাদের উঠোনটা, কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়ে ভিজে যায় সে উঠোনের একটি কোনা এবং ভিজে থাকে সেটা অনেকক্ষণ— আর কিছু না কেবল আনন্দ-বেদনার সাক্ষী হয়ে।

বাবা কিছুটা উদ্বিগ্নের মতো দৌড়ে এসে আমাকে বলেন, 'কিরে, কখন এলি?'

'এই তো একটু আগে।'

'খুব ভালো করেছিস।' বাবা মিতির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'যা তো মা ভেতরে যা, আমি ওর সাথে একটু প্রাইভেট কথা বলব।'

মিতি পা বাড়াতেই বাবা মিতিকে ফিরিয়ে আনন্দিত গলায় বলেন, 'ওকে সুখবরটা বলেছিস মা?'

মিতি কিছু বলার আগেই আমি বলি, 'আমি শুনেছি বাবা।'

'শুনে তোর কেমন লেগেছে?'

'তোমার যেমন লেগেছিল।'

'আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম রে।' বাবার চোখ টলটল করছে, 'জানিস, অফিসে কী একটা কাজ করছিলাম, এমন সময় মিতি আমাকে ফোন করে। প্রথমে আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি, মনে হয় ভুল শুনছি। মিতি একটু অপেক্ষা করে

আবার বলে, বাবা তুমি শুনতে পেয়েছ ? আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না। মিতি একটু শব্দ করে আবার বলতেই আমি চিৎকার দিয়ে উঠি। কী কেলেংকারী! অফিসের সব লোক দেখি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এরই মধ্যে আমাদের একাউন্টেন্ট বজলু সাহেব আমার দিকে এগিয়ে এসে বলেন, কী হয়েছে লিয়াকত সাহেব ? আমি তখন কেঁদে ফেলি রে। কাঁদতে কাঁদতেই আমি বলি, আমার মেজ মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে, গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে ও। কথাটা আমাদের অফিসের ডিরেক্টর স্যার শুনে ফেলেন। তিনি তখনই পিওনকে দিয়ে দশ কেজি মিষ্টি আনান। এত মিষ্টি কি আর খাওয়া যায়! অফিসের সবাই দুই কেজির মতো খেয়েছে, বাকি মিষ্টি ডিরেক্টর স্যার জোর করে আমার হাতে দিয়ে বলেন, লিয়াকত সাহেব, আজ আর আপনার অফিস করতে হবে না, আপনি এখনই বাসায় চলে যান।'

কথাগুলো বলতে বলতে বাবা হাঁপিয়ে ওঠেন। মা ডাকতেই মিতি রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর বাবা বুক ভরে একটা নিয়ে বলেন, 'জানিস, ডিরেক্টর স্যার আর কি করেছেন ?'

'কী বাবা ?'

'মিষ্টির প্যাকেটগুলোর সঙ্গে তিনি আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বলেন, আপনার মেয়েকে দেবেন আর বলবেন, ও শুধু আপনার মেয়ে না, আমাদের সকলের মেয়ে।'

'খামে কী ছিল বাবা ?'

'যা থাকার কথা তাই ছিল। বাসায় এনে খামটা মিতির হাতে দিতেই মনু ওর হাত থেকে নিয়ে খুলে দেখে চারটা কচকচে নতুন পাঁচশ টাকার নোট।' বাবা খুব আনন্দ নিয়ে কথাটা বলেই আমার আরো একটু কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এদিকে আরেকটা কাণ্ড করে ফেলেছি রে।'

'কী কাণ্ড বাবা ?

'কী আবার, মুখ ফসকে তোর মাকে বলে ফেলি মিতির এত ভালো রেজাল্ট চলো না আজ পোলাও খাই। তোর মা সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলে, খাওয়া যায়। প্রতি ঈদে যে পোলাওয়ের চাল কেনেন সেখানে থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কিছু চাল জমা করেছি। যা জমা হয়েছে তা দিয়ে সাত-আটজনের হয়ে যাবে। এর পরই তোর মা বলে, পোলাও তো হলো, কিন্তু এর সঙ্গে তো মাংস লাগবে। আমি বললাম, কয় কেজি লাগবে ? তোর মা বলল, দুই কেজি হলেই চলবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, আমি এখনই নিয়ে আসছি। এ কথা শুনে লুবা বলে, একটা বড় কোল্ড ডিঙ্কসও এনো তো বাবা। পোলাও খাওয়ার পর কোল্ড ডিংঙ্কস অনেক মজার বাবা।'

'ভালোই তো। অনেকদিন পর আমরা এক সঙ্গে পোলাও খাব।'

'ভালো তো আমিও ঝুঝি। কিন্তু মুশকিল হলো পকেটে টাকা যা আছে তা দিয়ে বড় জোর দেড় কেজি মাংস হবে। এদিকে তোর মা আবার এরই মধ্যে আজমল সাহেব আর স্ত্রীকে দাওয়াত দিয়ে ফেলেছে। বুড়ো মানুষ, ছেলে-মেয়ে সব বিদেশে থাকে, একা একা থাকে, কী না কী খায়, মিতির রেজাল্ট উপলক্ষে তাই একটু খাওয়ানো আর কী।'

'কোনো অসুবিধা নেই বাবা, আমার কাছে টাকা আছে।'

'আছে!' হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচেন বাবা।

শেপু আপা আমাকে যে টাকাগুলো দিয়ে ছিল তার কিছু খরচ করে ফেরেছি, বাকী সব টাকা আমি বাবার হাতে দিলাম। বাবা টাকাগুলো দেখেই আপত্তির স্বরে বললেন, 'এত টাকা কেন, দুইশ টাকা হলেই তো চলবে।'

আমি জোর করে বাবার হাতে টাকাগুলো গুজে দিয়ে বলি, 'বাবা, আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'অনুরোধ!' বাবা ম্লান হেসে কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলেন, 'কী অনুরোধ বল।'

'অনুরোধটা রাখতেই হবে বাবা।'

বাবা আগের মতো অস্বস্তি নিয়ে বলেন, 'আগে বল তো।'

'আজ তুমি খুব দামি একটা সিগারেটের প্যাকেট কিনবে। খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় বসে আমরা আজ সারারাত গল্প করব। তুমি গল্প করবে আর সিগারেট খাবে। আমরা মুগ্ধ হয়ে তোমার সে সম্মোহিত করা সিগারেট খাওয়া দেখব।'

'পাগল! সিগারেট খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি না।'

'তা তো জানি। ছেড়ে দেওয়ার পর মাত্র একদিন খেলে কিছু হয় না বাবা।'

বাবা আর কিছু বলেন না। সারাজীবন দাসত্ব করা বাবা কিছুটা নাচার মতো করে চলে যান। বাবার এ আনন্দময় হেঁটে যাওয়া দেখতে দেখতে চোখে পানি এসে যায় আমার। ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে তবু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি আমি বাবার দিকে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে দৌড়ে গিয়ে ছোটবেলার মতো বাবার একটা আঙুল ধরি, নির্ভরতার আঙুল। যে আঙুল ধরলে চোখ বুঝে চলা যায় অনন্তকাল!

খেতে বসেছি আমরা সবাই। সুন্দর একটা শাড়ি পরে আছে মিতি। একটু আগে আজমল আঙ্কেল আর আন্টি এসে শাড়িটা মিতির হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'যাও তো মা, শাড়িটা পরে আসো।' মন্ত্রমুগ্ধের মতো শাড়িটা হাতে নিয়ে মিতি ওর ঘরে চলে গিয়েছিল।

মিতির এই মন্ত্রমুগ্ধ হওয়ার একটা কারণ আছে। আঙ্কেল আর আন্টির ছোট ছেলেটা আর সবার মতো সিডনীতে থাকে এবং কম্পিউটার সায়েন্সে লেখাপড়া করে, নাম লিওন। আঙ্কেল-আন্টির খুব ইচ্ছে লেখাপড়া শেষে মিতির বিয়ে দেবেন

তার সঙ্গে। কথাটা মা-বাবাকে আন্তরিকতার সঙ্গে বেশ কয়েকবার বলেছেনও তারা। বাবা-মা রাজি, মুখে কিছু না বললেও মিতির চেহারা দেখে বোঝা গেছে রাজি মিতিও।

শাড়িটা পরে চলাফেরা করতে মিতির বেশ অসুবিধা হচ্ছে। ও তবু হবু শ্বশুর-শাশুড়ির যত্নে যেন কোনো ত্রুটি না হয় তাই কিছুটা দৌড়াদৌড়ি করে এটা ওটা করছে, আর আঙ্কেল-আন্টি মুগ্ধ হয়ে তা দেখছেন। একটু পর আন্টি মিতিকে কাছে ডেকে পাশে বসিয়ে বলেন, 'আর কিছু করতে হবে না তোমার, তুমি আমার একটু পাশে বসো তো মা। তোমার রেজাল্ট শুনে আমরা এত খুশি হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে লিওনকেও জানিয়েছি।'

লিওনের কথা শুনে মাথা নিচু করে ফেলে মিতি। আন্টি তাই দেখে হাসতে হাসতে বলেন, 'তোমাকে অনেক পড়তে হবে মা, লেখাপড়ার খরচ নিয়ে কোনো চিন্তা করবে না—।'

আন্টির কথাটা শেষ হওয়ার আগেই আঙ্কেল বলেন, 'তোমার লেখাপড়ার খরচ আমরা দেব।' কথাটা বলে একটু থেমে আঙ্কেল আবার বলেন, 'এবার বলো তো মা কেন দেব?'

কিছু বলে না মিতি, মাথা আরো নিচু করে ফেলে ও। আঙ্কেল ওর মাথায় একটা হাত রেখে বলেন, 'আমার দিকে একটু তাকা তো মা, দেখ, শুধু লিয়াকত সাহেব না আমিও তোর বাবা।' আঙ্কেল মিতির মাথাটা পরম মমতায় তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেন, আন্টি একটা হাত রাখেন আঙ্কেলের পিঠে। কী আশ্চর্য, দু'জনের চোখেই জল, তারা কাঁদছেন। পাঁচ ছেলে-মেয়েকে পৃথিবীতে এনেও একা হয়ে যাওয়া এই নিঃসঙ্গ দম্পতিকে দেখে আমরাও কেঁদে ফেলি। বাবা খুকখুক করে কাশতে থাকেন, মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকার উছিলায় চোখ মোছে, লুবা ওর প্লেটে রাখা পোলাওগুলো নাড়তে থাকে এমনি এমনি, মনু আপা খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের প্রাচীন ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে রাখা খাবারগুলো আবার সাজাতে থাকে টুকটাক করে ।

লুবা হঠাৎ অঁ অঁ করে উঠে দাঁড়ায়। মনু আপা কিছুটা দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কী হয়েছে লুবা?'

মুখ বিকৃত করে লুবা বলে, 'তেলাপোকা—।'

'কোথায় তেলাপোকা?'

'পোলাওয়ে।'

'পোলাওয়ে!' মনু আপা লুবার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলে, 'পোলাওয়ে কোথায় তেলাপোকা পেলি তুই?'

আগের মতোই মুখটা বিকৃত করে লুবা বলে, 'তুমি মুখে দিয়ে দেখ।'

মনু আপা লুবার প্লেট থেকে কিছুটা পোলাও মুখে দিয়ে একটু পর খুব স্বাভাবিকভাবে সেগুলো আবার বের করে ফেলে মুখ থেকে। তারপর মুখের পোলাওগুলো হাতের মধ্যে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। আমি মার মুখের দিকে তাকাই। মার ফর্সা মুখটা আরো ফর্সা হয়ে কেমন ফ্যাকসে দেখাচ্ছে, বাবা আগের মতো এমনি এমনি খুকখুক করে কাশছে, লুবা মনু আপার পিছে পিছে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অঁ অঁ করে বমি করার চেষ্টা করছে, সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে আমার মিতিকে দেখে। আজমল আঙ্কেল আর আন্টির মাঝখানে বসে বেচারি না পারছে উঠে আসতে না পারছে বসে থাকতে। মাথা নিচু করতে করতে ওর থুতনিটা প্রায় গলার সাথে লেগে গেছে। লজ্জায় সম্ভবত ওর চোখ ভরে পানি এসে গেছে, যা সেনসিটিভ মেয়ে! লেখাপড়া নিয়ে মা একবার কী যেন বলেছিল ওকে। কথাটা শুনে ও চুপ করে বসেছিল অনেকক্ষণ, শেষে রাগতে রাগতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছে মিতি এখন অজ্ঞান না হয়ে যায়। আরেকটা কেলেংকারি ব্যাপার হয়ে যাবে তাহলে!

রান্নাঘর থেকে মনু আপা ফিরে আসতেই আন্টি বললেন, 'মা শোনো—।' মনু আপা আন্টির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আন্টি বলেন, 'পোলাওয়ের চাল পুরাতন হলে কখনো কখনো এরকম গন্ধ হয়, তাছাড়া চাল অনেকদিন ঘরে থাকলে অসাবধানবশত তেলাপোকা যেতেই পারে, চাল নষ্ট করতেই পারে। অনেকের সংসারেই এরকম কিছু না কিছু হয়। তাছাড়া—।'

আন্টিকে থামিয়ে দিয়ে আঙ্কেল আন্টিকে বলেন, 'ওই যে একবার আমদেরও কী যেন হয়েছিল, খাবার মুখে দিতেই..., বলো না।'

কিছুটা রেগে গিয়ে আন্টি আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'না বলতে হবে না।' তারপর মনু আপার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'প্লিজ, কোনোরকম বিব্রতবোধ করো না তোমরা। তুমি শুধু পোলাওগুলো ফেলে দাও, বাকি জিনিসগুলো টেবিলে এভাবেই সাজানো থাক। আমি একটু আমাদের বাসা থেকে আসি।'

আঙ্কেল উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমিও আসব ?'

'না, তুমি নাকি গল্প করার মানুষ খুঁজে পাও না, সবার সঙ্গে গল্প করো তুমি।' আন্টি মিতির একটা হাত ধরে বলেন, 'মা, তুমি চলো আমার সঙ্গে।'

মিতির হাত ধরে আন্টি ওকে নিয়ে যাচ্ছেন তার বাসায়। আমার বুকের ভেতর ধুক করে ওঠে হঠাৎ। মিতির চলে যাওয়া দেখতে দেখতে আমার চোখে ভেসে ওঠে— খুব সেজে-গুজে লাল একটা শাড়ি পরে মিতি হেঁটে যাচ্ছে আর কাঁদছে। আন্টিও হেঁটে যাচ্ছেন, পরম মমতায় ছেলের বৌয়ের হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছেন আনন্দ মনে।

এক ঘণ্টাও হয়নি, আন্টি আর মিতি ফিরে এসেছে। তাদের দুজনের হাতে দুটো বড় বড় খাবারের ডিস, সেখান থেকে পাগল করা একটা সুবাস এসে সরাসরি আঘাত করছে পেটের মাঝখানটায়। পোলাওয়ের গন্ধ যে এত মধুর হতে পারে তা কখনো জানা ছিল না আমার।

টেবিলে ডিস দুটো রেখে আন্টি প্রকৃত গৃহকর্ত্রীর মতো কিছুটা গম্ভীর গলায় বললেন, 'আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করা যাবে না, আমরা এখন সবাই খেতে বসব।'

'আমরাও বসব ?' অর্পা আর অর্ণা হাসি হাসি মুখ করে ঘরে ঢুকেই টেবিলের পাশে মস্ত বড় একটা কেকের প্যাকেট রেখে অর্পা বলল, 'মিতির জন্য ড্যাড পাঠিয়েছে।' তারপর মিতিকে কিছুটা জড়িয়ে ধরে বলে, 'কনগ্রাচুলেসন্স। জীবনে কোনো কোনো সময় খুব আনন্দ নিয়ে কাঁদতে হয়, আজ সেরকম একটা দিন।' বলেই অর্পা চলে যেতে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে আন্টি বলেন, 'এই পাজি মেয়ে, কোথায় যাচ্ছো?'

অর্পা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'পালাচ্ছি।'

'পালাবেই তো। সারাদিন শুধু দুষ্টুমি আর দুষ্টুমি। বাসায় আসার নাম নেই শুধু টেলিফোনে বকবকানি।' আন্টি মনু আপার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'জানো, এ পাজি দুটো কী করে ? আমরা এত পাশাপাশি বাসায় থাকি, তবু এ পাজি দুটো দুটো বাসায় আসে না, শুধু টেলিফোন করে আর এটা বলে ওটা বলে। একদিন হয়েছে কী জানো—।' অর্পাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আন্টি বলেন, 'মেয়েটা আমাকে ফোন করে বলে, আমার নাম ভ্রু-ছেলা মর্জিনা। আমি নাককাটা জব্বার, দাঁতপড়া কুদ্দুসের মতোই একজন। ওরা পুরুষ আর আমি মেয়ে, কিন্তু আমি ওদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নই। আমি বলি, আমাকে কী করতে হবে ? মেয়েটা আগের চেয়ে গম্ভীর গলায় বলে, আপাতত কিছু করতে হবে না। তবে কিছুদিন পর কিছু একটা চাইব তখন সেটা দিতে হবে। নইলে—। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, নইলে কী ? নইলে কী সেটা পরে বুঝবেন। বলেই ফোনটা রেখে দেয়। ভয়ে তো আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে যাওয়ার দশা আমার। হঠাৎ খেয়াল হলো, আরে অর্পার গলার মতো তো মনে হলো মেয়েটার গলা! সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের বাসায় ফোন করি, ফোনটা ওই ধরে। আমি তখন খুব স্বাভাবিক গলায় বলি, ভ্রু-ছেলা মর্জিনা ম্যাডাম আছেন এখানে ? আমার কথাটা শুনে তারপর মেয়েটার যা হাসি। তবে সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছিলাম সেদিন।'

অর্পা মুখটা অপরাধীর মতো করে বলে, 'আমি স্যরি, আন্টি।'

'হয়েছে, অনেক বলেছ স্যরি, আর বলতে হবে না।।' আন্টি কিছুটা এগিয়ে এসে অর্পা আর অর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'মা মরা মেয়ে দুটো, বড় মায়া লাগে!' ওদের দুজনের দুটো হাত ধরে আন্টি আবার বলেন, 'আসো খাবে।'

'স্যরি আন্টি—।'

'আবার স্যরি!'

'এবার খেতে না পারার জন্য স্যরি।'

'কেন, খেতে না পারার কারণ কী ?

'বাবা গাড়িতে বসে আছেন বাইরে। আজ আমার এক কাজিনের বিয়ে, আমরা সবাই যাচ্ছি সেখানে।'

'অ। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও তাহলে। আর শোনো, বাসায় না এসে আবার টেলিফোন করলে এবার নাক টেনে ছিঁড়ে ফেলব কিন্তু।'

অর্পা আর অর্ণাকে এগিয়ে দিচ্ছি আমি। গেটের কাছে এসেই অর্পা দাঁড়িয়ে পরে। আধো আলো আধো অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে ও খুব বিষণ্ন গলায় বলে, 'আমাদের হয়তো আরো বেশি দামি ঘরের দরজা হবে, খাট হবে, সোফা হবে, অনেক কিছুই হবে। কিন্তু বাবা-মা, ভাই-বোনকে একসঙ্গে নিয়ে আমাদের কখনোই খেতে বসা হবে না, গল্প করা হবে না, বারান্দায় বসে জ্যোৎস্না-ভেজা রাত দেখা হবে না।'

'একটা প্রশ্ন করব ?'

অর্পা আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন দেখে। তারপর কিছুটা দুঃখী দুঃখী গলায় বলে, 'আজ থাক, অন্যদিন।'

ঘুম ভাঙল মোখলেস ভাইয়ের ডাকে এবং ঘুম ভাঙতেই অনুভব করলাম— যাক, আরেকটা দিন বেঁচে আছি। ভালো করে চোখ মেলেই ছোট্ট করে একটা চিৎকার দিলাম, সে বেঁচে থাকার আনন্দে নয়, ঝলমলে রোদে ঘর ভরে যাওয়ার জন্যও নয়, জানালার কাঠে একটা দোয়েলের লেজ নাচানো দেখেও নয়। খোলা জানালা দিয়ে একটা গাঢ় সবুজ পাতার ডাল উঁকি দিচ্ছে আমার ঘরে এবং সেখানে লাল টকটকে একটা রক্তজবা ফুটে আছে গর্বিত ভঙ্গিতে। অনেকদিন এরকম একটা চোখ ভরে ওঠা মুগ্ধ দৃশ্য দেখিনি আমি।

মোখলেস ভাই এবার একটু শব্দ করে বললেন, 'দন্ত্যন ভাই।'

এক ঝটকায় বিছানা থেকে উঠে বসলাম এবং দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে দেখলাম কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে পা দুটো এদিক ওদিক নাড়াচ্ছেন মোখলেস ভাই।

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে আমি বললাম, 'কী ব্যাপার মোখলেস ভাই ?'

'দরজাটা একটু খোলেন।'

দরজাটা খুলে দিলাম আমি। মোখলেস ভাই কিছুটা অপরাধী চোখে বললেন, 'সকাল সকাল ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম আপনার।'

'না, ঠিক আছে।' মোখলেস ভাইয়ের দিকে ভালো করে তাকিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার ?'

'স্যার আপনাকে ডাকছেন।'

'আমাকে!'

'হ্যাঁ, আপনার কথাই তো বললেন।'

'কোনো সমস্যা ?'

'সে রকমই তো মনে হচ্ছে।'

মোখলেস ভাইয়ের একটা হাত ধরে ঘরে এনে বলি, 'কী ধরনের সমস্যা মোখলেস ভাই ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। স্যার বোধহয় ঘুমাননি সারারাত।'

'কেন ?'

'কোনো কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি।'

'অর্পা অর্ণা কোথায় ?'

'ঘুমাচ্ছে।'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'আপনি যান, আমি আসছি।

মোখলেস ভাই চলে যেতে নিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ান। আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলেন, 'একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে।'

'বলুন।'

'কথাটা বলা আসলে ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না।'

'আগে বুঝে নিন-ঠিক হবে, কি হবে না।'

মোখলেস ভাই মাথা নিচু করে কী একটা ভাবেন। বেশ কিছুক্ষণ পর মাথাটা উঁচু করে বলেন, 'জীবনে কখনো কোনো অন্যায় করেছি কি না মনে পড়ে না, কোনো অন্যায় দেখলে তাই তা সহ্যও হয় না। কিন্তু...।'

থেমে যান মোখলেস ভাই। আমি মোখলেস ভাইয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে বলি, 'সম্ভবত আপনি অন্য একটা কথা বলতে চেয়েছিলেন।'

মাথাটা আগের মতোই নিচু করতে করতে মোখলেস ভাই কিছুটা অস্ফুট স্বরে বলেন, 'হ্যাঁ।'

'কথাটা আমি জানি।'

ঝট করে মোখলেস ভাই আমার চোখের দিকে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে আমি হেসে ফেলি। আমি স্পষ্ট টের পাই আমার হাসিটা ঠিক হাসি হয়ে উঠেনি। একটা ফুটন্ত হাসির জন্য যতটুকু আনন্দের উপকরণ লাগে, তার একটুও নেই আমার মুখে; যতটুকু চাঞ্চল্য দরকার, তার একটুও নেই মনে। হাসির আভাটা ছড়িয়ে যাওয়ার আগেই থমকে যায় ঠোঁটের কোনায় এবং থেমে যাওয়ার আগেই আরো ম্লান হয়ে যায় সেটা।

মোখলেস ভাই মাথাটা আবার নিচু করে ফেলেন। কী আশ্চর্য! জলে ভরে গেছে তার চোখ দুটো, আমারও। দুজনেই আমরা একই দুঃখে কাঁদছি, অথচ আমাদের দুজনের মাঝে চিরকালীন কোনো সম্পর্ক নেই— না রক্তে, না মননে, না আত্মায়।

যতটা অবাক হওয়ার কথা, ততটা অবাক হতে পারলাম না, কিন্তু ব্যাপারটা অবাক হওয়ার মতো। বদিউল আঙ্কেল পা তুলে বসে আছেন সোফাতে, বসে আছেন কিছুটা ঋষির মতো। চোখ দুটো বুজে আছে তার। তিনি ঘুমাচ্ছেন না এমনি এমনি চোখ বুজে আছেন বুঝা যাচ্ছে না তা। তবে দৃষ্টিকটু লাগছে যা— তিনি তার লুঙ্গিটা গুছিয়ে হাঁটুর অনেক ওপরে তুলে রেখেছেন, এটা ছাড়া তার শরীরে একটা সুতোও নেই।

বদিউল আঙ্কেলের সামনের ছোট টেবিলের ওপর বেশ কয়েকটা বোতল রাখা, প্রায় খালি হয়ে গেছে বোতলগুলো। একটা গ্লাস কাত হয়ে পড়ে আছে পাশে।

অ্যাস্ট্রেতে সিগারেটের টুকরোগুলো উপচে পড়ছে। সারা ঘর অন্ধকার অন্ধকার, কেবল পুব পাশের জানালার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝের কার্পেটে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। এ মুহূর্তে আমার কী করা উচিত বুঝতে পারছি না-ঘরে ঢুকব না, চলে যাব ? পেছন ফিরে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বদিউল আঙ্কেল বললেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন দন্ত্যন ? ভেতরে আসো, প্লিজ।'

আগের মতোই চোখ বুজে আছেন বদিউল আঙ্কেল। আমি ঘরের ভেতর পা বাড়াতেই তিনি আবার বললেন, 'আমার সামনে বসো।'

বদিউল আঙ্কেলের সামনের সোফাটায় বসলাম আমি। তিনি সোফা থেকে পা নামিয়ে লুঙ্গিটা ঠিক ঠাক করে বসলেন, 'তোমাকে এত সকালে কেন ডেকেছি জানো ? কারণ আছে, অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে— , আচ্ছা তার আগে আরেকটা কথা বলে নেই। তুমি আমার দিকে একটু ভালো করে তাকাওতো দন্ত্যন।'

খুব মনোযোগ দিয়ে আমি আঙ্কেলের দিকে তাকালাম। আঙ্কেলও উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর কিছুটা হাসতে হাসতে বললেন, 'কি কিছু বুঝতে পারছ ?'

'না, তেমন কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আরে বাবা, একটু সময় নাও, জাস্ট একটু, আমার দিকে আরো ভালো করে তাকাও, তারপর বলো।'

আরো একটু মনোযোগ দিয়ে আমি বদিউল আঙ্কেলের দিকে তাকালাম। লুঙ্গিটা তিনি এমনভাবে পরেছেন, যেন করুণা করে নিজের শরীরের সঙ্গে রেখেছেন, নিতান্ত অবহেলায় সেটা ঝুলে আছে কোমরের একেবারে নিচের অংশে।

'কি, এবার কিছু বুঝলে?'

কিছুটা আমতা আমতা করে আমি বললাম, 'জি...।'

আমার কথাটা শেষ করার আগেই আঙ্কেল বললেন, 'রাইট, একদম ঠিক বুঝেছ। সারারাত আমি ঘুমাইনি। এবার বলো তো বাপজান, স্যরি, ভাইজান- সারারাত কেন ঘুমাইনি আমি ? নো নো, এত দ্রুত আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না। একটু ভাবো, একটু চিন্তা করো, একটু...একটু...।' আঙ্কেল পাশে পড়ে থাকা গ্লাসটা তুলে এমনি এমনি ঠোঁটে ঠেকিয়ে ধরে রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ দুটো একটু সরু করে, সেখানে একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি এনে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন খুব বুদ্ধিমানের মতো একটা কথা বলেছেন তিনি আমাকে।

গ্লাসটা মুখ থেকে সরিয়ে তিনি এবার বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কি, কিছু পেলে ?' আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আঙ্কেল বললেন, 'আজকালকার

ছোকরা তোমরা, কতটুকু বুদ্ধিবা তোমরা রাখো ?' বলেই তিনি বিকট শব্দে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। তার এক হাতে খালি গ্লাসটা, আরেক হাত দিয়ে লুঙ্গির গিট্টুটা ধরে রেখেছেন। দুটোই এ মুহূর্তে বিপদজনক, দুটোর যে-কোনো একটা থেকে হাত সরিয়ে নিলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু না, সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার আগেই আঙ্কেল আবার বসে পড়লেন। তিনি এবার খালি গ্লাসটা ভরে ফেললেন একটা বোতল খালি করে। গ্লাসটা তারপর ঠোঁটে ঠেকিয়েই দীর্ঘ একটা চুমুক দিলেন। তৃপ্তির মাত্রাটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তেই বললেন, 'সবাই আমাকে কী বলে জানো— আমি নাকি আমার বৌকে মেরে ফেলেছি। এটা একটা কথা হলো বলো ? একমাত্র বৌকে কেউ মেরে ফেলে ? শাহানা আমার একমাত্র বৌ ছিল, ছিল কি, এখনো আছে। এই যে, এই যে—।' আঙ্কেল নিজের বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বলেন, 'আমার বুকটা দেখছ, আমি সেখানে তাকে লুকিয়ে রেখেছি, চুপটি করে লুকিয়ে রেখেছি। কেউ জানে না, কাউকে জানতে দেইনি, আজ শুধু তোমাকে বললাম। ইয়ে, তুমি আবার কাউকে বলো না কিন্তু, ওকে ?' হেঁচকি দিয়ে উঠলেন আঙ্কেল।

'আঙ্কেল, আপনার এখন একটু রেস্ট দরকার।'

বড় বড় চোখ করে আঙ্কেল আমার দিকে তাকালেন, 'কী বললে ? রেস্ট দরকার, আমার রেস্ট দরকার! আমি কি সারারাত মাটি কেটেছি না রিকশা চালিয়েছি যে আমার এখন রেস্ট নিতে হবে ? শোনো ছোকরা, আমাকে জ্ঞান দিতে আসবে না, একটুও না। আমার এই মাথাটায় যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এমন কি আমার পেট, নাক, পায়ের আঙুলেও জ্ঞান আছে, যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। যাক, তোমাকে সেসব বলে লাভ নেই। তোমাকে যা বলছিলাম, অ্যাঁ, তোমাকে যেন কী বলছিলাম ?'

'সারারাত আপনি কেন ঘুমাননি...।'

'রাইট, সারারাত আমি কেন ঘুমাইনি ? কারণ হচ্ছে কাল সারারাত অনেক প্রশ্ন উদয় হয়েছে আমার মনে, বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটেছে আমার মাথায়।' আঙ্কেল সুর করে বলেন, 'মাথায় কত প্রশ্ন আছে দিচ্ছে না কেউ জবাব তার...ইয়ে, পরের লাইনটা যেন কী ?'

'জানি না আঙ্কেল।'

'জানো না মানে! তোমরা আজকাল কবিতা-টবিতা পড়া ভুলে গেলে নাকি। ও তা ভুলবে কেন, তোমরা তো আজকাল আমি-তুমি মার্কা কবিতা পড়ো— আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি কি ভালোবাসো, রাবিস!' আঙ্কেল গ্লাসটা আবার মুখে ঠেকিয়ে বলেন, 'আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দাও তো দেখি। এই ধরো—।' আঙ্কেল কী যেন ভেবে বলেন, 'বলো তো, কে বেশি শক্তিশালী— আমি, না বাঘ ?'

'আপনি।'

খুব আনন্দ নিয়ে গ্লাসে আরেকবার চুমুক দিয়ে জিনিসগুলো গিলতে গিলতে আঙ্কেল বলেন, 'আমি! আমি কেন শক্তিশালী বলো তো ?'

আঙ্কেলের দেয়ালে একটা বাঘের চামড়া ঝুলানো আছে, আমি সে চামড়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনার দেয়ালে বাঘের একটা চামড়া আপনি ঝুলাতে পেরেছেন, কিন্তু বাঘ কখনো তার বাসায় আপনার চামড়া ঝুলাতে পারবে না।'

কপাল কুঁচকে আঙ্কেল আমার দিকে তাকালেন। তারপর একটু ভেবে কী বুঝে তিনি হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, 'ঠিক ঠিক। এবার বলো তো দেখি কে বেশী ক্ষমতাবান— একটা মশা, না আমি ?'

'মশা।'

'মশা! এটা কী বলছ তুমি ?' চিৎকারে কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে হেঁচকি উঠে যায় আঙ্কেলের।

'জি আঙ্কেল। মশার এমন ক্ষমতা যে, সে যে-কোনো সময় আপনার মুখের ভেতর ঢুকতে পারে, কিন্তু আপনি হাজার চেষ্টা করলেও মশার মুখের ভেতর কখনোই ঢুকতে পারবেন না।'

খালি হয়ে যাওয়া গ্লাসটা আবার ভর্তি করে আঙ্কেল বলেন, 'এটা তো কখনো ভাবিনি, ডেঞ্জারাস ব্যাপার। আচ্ছা, আমরা আগের ব্যাপারটা মানে বাঘের ব্যাপারে আসি। বলো তো-একটা বাঘ আর একটা মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি ?'

'বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, কিন্তু মানুষের বাচ্চা সব সময় মানুষ হয় না।'

'ঠিক আছে, বাচ্চা প্রসঙ্গ যখন আসলোই এবার তাহলে মানুষের বাচ্চা নিয়ে একটা প্রশ্ন করি। বলো তো— মানুষের বাচ্চা আর গরুর বাচ্চার মধ্যে মিল কি ?'

'ছোটকালে উভয়ই গরুর দুধ খায়।'

চোখ বড় বড় করে আঙ্কেল বলেন, 'তাই তো, কী আশ্চর্য মিল! থ্যাঙ্কস দন্ত্যন। শোনো, কাল রাতে জেগে থাকার কারণে বহুদিন পর একটা জিনিস শুনেছি আমি, শেয়ালের ডাক শুনেছি। কতদিন পর শেয়ালের ডাক শুনলাম! শুধু গ্রামে না, অনেক শহরেও শেয়াল দেখা যায় এখনো। উত্তরায়, এয়ারপোর্টের দিকে রাত হলেই বিকট চিৎকার শোনা যায় শেয়ালের। আমাদের গ্রামে একদিন কী হয়েছিল জানো ? তিনদিনের একটা ছেলেকে শেয়াল ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সারা গ্রামের মানুষের সহায়তায় অনেক কষ্টে ছেলেটাকে উদ্ধার করা হয় শেষে। ছেলেটা এখন বড় হয়ে গেছে, এখনো শেয়ালের কামড়ের দাগ আছে তার ডান কাঁধে। সেই ছেলেটা এখন কী হয়েছে জানো, কমিশনার হয়েছে। শেয়ালের মতো সে নাকি ইদানীং রাত-বিরাতে এর-ওর বাড়ি ঢু মেরে বেড়ায়, মেয়েমানুষ খুঁজে বেড়ায়। আচ্ছা, এবার বলো তো দেখি— শিয়াল রাতে ডাকে, কিন্তু দিনে ডাকে না কেন?'

'দিনে রাজনীতির নেতারা ডাকে মানে ভাষণ-বিবৃতি দেয় তো, তাই শেয়ালরা ডাকার চান্স পায় না।'

আর কিছু বলেন না আঙ্কেল। অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকেন। এক সময় দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'মানুষ হয়েও কখনো কখনো নিজেকে পশু মনে

হয়, কাল রাতে আমার যেমন হয়েছিল। তুমি কি জানো মানুষের দেহে নাকি পশুর দুটো হাড় থাকে ?'

'ঠিক জানি না, তবে অনেকের দেহে আস্ত একটা পশুই থাকে।'

আঙ্কেল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান, তারপর আমার সামনে আসেন টলতে টলতে। আমিও উঠে দাঁড়াই। হঠাৎ কপালে হাত ঠেকিয়ে আমাকে চমকে দিয়ে একটা স্যালুট করে বসেন তিনি। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। কপালে হাত ঠেকিয়ে আঙ্কেল মিটি মিটি হাসছেন, কিন্তু তার চোখ দিয়ে টপ টপ পানি ঝরছে, কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে ফেলা বাচ্চার মতো কাঁদছেন তিনি।

ড্রইংরুমে বসে আছে অর্পা। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মাথাটা নিচু করে বলল, 'স্যরি।'

অবাক হয়ে আমি বললাম, 'স্যরি কেন ?'

'ড্যাড আপনাকে আজ খুব বিরক্ত করেছে, না ?'

'কিন্তু আমি বিরক্ত হইনি।'

'কাল আম্মুর মৃত্যুবার্ষিকী ছিল তো।'

'আচ্ছা, আঙ্কেল কী যেন সব বলছিলেন, আপনার আম্মু মারা গিয়েছেন কীভাবে ?'

বেশ কিছুক্ষণ পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অর্পা বলে, 'এ প্রসঙ্গটা থাক।' অর্পা একটু থেমে বলে, 'কয়েকদিন আগে আপনার সঙ্গে একটা মেয়েকে দেখেছি আমি।'

'কোথায়?'

'রমনার ফুটপাত দিয়ে আপনারা দুজন হাঁটছিলেন, রাত তখন সাড়ে বারোটার মতো হবে।'

'অ, সোমা ছিল আমার সঙ্গে। আপনি দেখলেন কীভাবে ?'

'খালার বাসা থেকে বাসায় ফিরছিলাম আমরা।' প্রচণ্ড আগ্রহ অথচ অর্পা বেশ নির্লিপ্তভাবে বলে, 'সোমা কে হয় আপনার ?'

'কেউ না।'

'কেউ না মানে, অন্ধকার রাতে দুজন এক সঙ্গে হাঁটছিলেন, অথচ সে আপনার কেউ হয় না!'

'অন্ধকার রাতে হাঁটার কারণ হচ্ছে সোমাদেরকে কেবল অন্ধকার রাতেই দেখা যায়।'

'কেন ?'

'অন্ধকার রাতের মানুষ যে ওরা!'

'তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কীভাবে!' অর্পা যতটা অবাক স্বরে কথাটা বলল তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে।

হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'কেন, এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকতে পারে না ?'

'না, পারে না। অন্তত আপনার মতো ছেলের থাকতে পারে না।'

'পারে।' খুব শান্ত চোখে আমি অর্পার দিকে তাকালাম, 'আমার মতো ছেলের সঙ্গেই পারে। জানেন, তার সঙ্গে আপনার পরিচয় কীভাবে ? রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম একদিন, একা একা, আমার মতোই। রাত তখন কত হবে-দুটো কিংবা একটু কম। তিন নেতার মাজারের কাছে গিয়েই দেখি, ফুটপাতে বসে একটা মেয়ে কাঁদছে। কৌতূহল না, খুব মানবিক হয়েই তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম— কী হয়েছে ? প্রশ্নটা আমাকে তিনবার করতে হয়েছে। শেষে মেয়েটি বলেছে, এ কয়দিন এগার শ' টাকা জমিয়েছিল সে, একটু আগে তিনজন পুলিশ টাকাগুলো নিয়ে গেছে। মেয়েটি আরো জানিয়েছে, গ্রামে তার মায়ের পরনের সবগুলো শাড়িই ছিড়ে গেছে, ছোট একটা ভাই ও বোন আছে, তারা না খেয়ে থাকে প্রায়ই, ছন দিয়ে ছাওয়া একমাত্র ঘরে বৃষ্টির পানি পড়ে মুক্ত মনে— আরো কত কী। পরশু টাকাগুলো পাঠাতে চেয়েছিল সে তার মায়ের কাছে, পাঠানো হবে না। অপেক্ষা করতে হবে। তার জন্য সস্তা লিপিস্টিক আর সস্তা পাওডারে নিজেকে সাজিয়ে শরীর বেচতে তাকে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে অনেকদিন।'

ছলছল চোখে অর্পা বলে, 'একদিন নিয়ে যাবেন আমাকে ?'

'কোথায় ?'

'সোমার কাছে।'

'কেন ?'

'ওর একটা হাত ধরব আমি।'

'কিন্তু সোমা আপনার হাত ধরবে না।'

কিছুটা টেনে টেনে সোমা বলে, 'কেন ?'

'ও প্রায়ই বলে, ওর হাত নাকি পচে গেছে। এ হাত নাকি কেউ ধরবে না, স্পর্শও করবে না কেউ। কথাটা শুনে আমি বলেছিলাম, আমি ধরব। ও তখন খুব স্বাভাবিকভাবে বলেছিল, করুণা করে ? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বুক খালি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, এ হাত শুধু মানুষ করুণা করেই ধরতে চায়, ভালোবেসে ধরে না কখনো।'

পুরো দুই ঘণ্টা ধরে সোমাকে খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না। আমার মাথায়ও ঢুকছে না এই রাত এগারটায় ওকে কোথায় পাব। ও যে যে জায়গায় থাকতে পারে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে তার সব জায়গায় খোঁজা হয়ে গেছে, কোথাও পাওয়া যায়নি ওকে।

সোমার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সকালে অর্পা না বললে ওর কথা হয়তো মনেই পড়ত না অনেকদিন।

রমনার পুকুর পাড়ে একটা মেয়েকে বসে থাকতে দেখে আমি একটু এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটা হাসতে লাগল। আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, 'সোমা নামে কাউকে চেনেন আপনি ?'

'চিনুম না ক্যান! ওরে কি দরকার ?'

'ছিল একটা দরকার।'

'একটা দরকার, না অনেক দরকার ?' খিলখিল করে হাসতে থাকে মেয়েটা, 'যাউগ্‌গা। সোমারেই লাগব না আমারে অলেই চলব ?'

মেয়েটার সঙ্গে আর কোনো কথা বলি না আমি। চলে আসি ওর কাছ থেকে। মেয়েটা আগের মতোই হাসতে থাকে খিলখিল করে।

চারুকলার অপর পাশে একটা চায়ের দোকান খোলা আছে। ফুটপাত থেকে উঠে বসে সেদিকে পা বাড়াতেই পেছন থেকে গম্ভীর হয়ে কে যেন বলে, 'দন্ত্যন ভাই ?'

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি সোমা দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুলে খোঁপা, খোঁপায় সাদা কী একটা ফুলের মালা, হালকা হলুদ রঙের জামা আর হাত ভরা কাচের চুরি। কিন্তু কী অবাক কাণ্ড, চোখ টলটল করছে ওর।

আমি একটু এগিয়ে সোমার সামনে দাঁড়াতেই ও বলল, 'আমাকে খুঁজছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

সোমা একটু থেমে অবাক হওয়া স্বরে বলে, 'সত্যি খুঁজছিলেন ?'

'কেন বিশ্বাস হয় না ?'

'না। কেউ আমাকে মনে রাখবে, অধীর আগ্রহে খুঁজবে এ কথাটা ভুলে গেছি আমি কবেই। ভুলে গেছি মনের আনন্দে গুনগুন করে গান গাওয়া, পায়ে নূপুর পরে নেচে নেচে হেঁটে যাওয়া, পাখির শিস শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকা কিংবা কোনো বুনো ফুলের গন্ধে থমকে যাওয়া। জানেন, মাঝে মাঝে নিজেকেই ভুলে যাই, ভুলে যাই একদিন আমিও একজন মানুষ ছিলাম!'

সোমার চোখ দুটো আরো টলটল করছে। এতক্ষণ খেয়াল করা হয়নি, কপালে একটা টিপও পরেছে ও। থোকা থোকা জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে রাতের এ ব্যস্ত শহর, সে জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে ওর চোখের পানিগুলো, চকচকে টিপটিও। মানুষ কখনো কখনো অন্য একজন মানুষকে স্পর্শ করতে দ্বিধা করে, সংকুচিত হয়, কিন্তু প্রকৃতি কখনো দ্বিধা করে না, সংকুচিত হয় না। সবাইকে সে আলো দেয়, ছায়া দেয়, বাতাস দেয়। যেমন পরম মমতা নিয়ে জ্যোৎস্না জড়িয়ে রেখেছে আমার সামনের এ মেয়েটাকে!

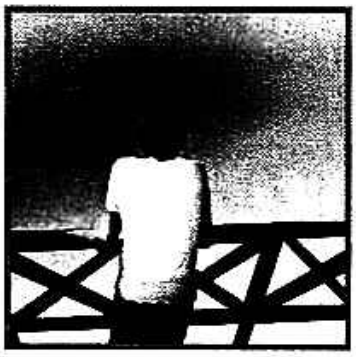

সম্ভবত আজ একটা বিশেষ দিন। তবে বিশেষ দিনটা যে কিসের এবং কার তা জানি না, বুঝতেও পারছি না। কয়েকদিন আগে বাবা বলেছিলেন, বিশেষ একটা দিনে তিনি একটা মাছ কিনে আনবেন, চিতল মাছ, পুরোটা না, কেজি খানেক। বাবা আজ মাছটা কিনে এনেছেন।

মাছটা নিয়ে বাবা বাসায় ঢুকেই মাকে এমনভাবে ডাক দিলেন, বাবার গলাটা থেকে কেমন একটা আনন্দ ঝরে ঝরে পড়ছিল। মা রান্নাঘরে ছিল, ভালোবাসাময় ডাক শুনলে মানুষ যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে বাবার ডাক শুনেই মা প্রায় তেমনি চঞ্চল পায়ে দৌড়ে গেল বাবার কাছে।

মা বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বাবা কিছুটা রহস্যময় চেহারা করে বললেন, 'একটা জিনিস নিয়ে এসেছি।'

খুব নির্ভারভাবে মা বলল, 'ভালো করেছেন?'

চোখ দুটো একটু কুঁচকে বাবা মায়ের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, 'ভালো করেছি! তুমি কি জানো আমি কী এনেছি?'

মা ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'জানি।'

'কীভাবে জানো?'

মা পূর্ণ চোখে বাবার দিকে তাকায়। তারপর কিছুটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, 'আজ একটা বিশেষ দিন।'

বাবা হাসতে হাসতে বলেন, 'বিশেষ দিনটা কার?'

'সেটা আপনি জানেন।'

'তুমি জানো না?'

'না।'

বাবার হাত থেকে মাছের প্যাকেটটা নিয়ে চলে নিতেই বাবা মাকে ডাক দেন, 'জাহানারা...।'

কিছুটা থমকে দাঁড়ায় মা, চমকে উঠি আমরাও। মনু আপা, আমি, মিতি আর লুবা বসে এক সঙ্গে গল্প করছিলাম আমার ঘরে। মাকে নাম ধরে ডাকতেই চমকে উঠি আমরা। কত দিন পর বাবা নাম ধরে ডাকলেন মাকে।

সংসার করতে করতে প্রায় প্রতিটা মা-ই তার নামটা একদিন ভুলে যান। ছোটকালে বাবার আঙুল ধরে কোথাও যেতে যেতে তার বাবা হয়তো তাকে একটা নাম ধরে ডাকতেন, মুখে খাবার তুলে দিতে দিতে মা ডাকতেন অন্য একটা নামে, স্বামীর ঘরে এসে শোনেন আরেক নাম, সন্তানের মা হওয়ার পর পরিচিত হোন আলাদা এক নামে। তারপর নানি কিংবা দাদি, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নাম। এত নামের ভিড়ে তার আসল নামটা সত্যি সত্যি একদিন ভুলে যান তিনি।

বাবা একটু এগিয়ে গিয়ে আবার হাসতে হাসতে বলেন, 'সত্যি তুমি জানো না।'

মা অনেকক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'কী হয় এসব মনে রেখে?'

'কিছুই হয় না।'

'তাহলে?

'তবু মনে রাখতে হয়।' মনু আপা আমার ঘর থেকে বের হয়ে কথাটা বলেই বাবার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বের হই ঘর থেকে। মনু আপা বাবার গায়ের শার্টের বোতাম খুলে দিতে দিতে বলে, 'বিশেষ দিনটা দুজনের মনেই থাক না বাবা।'

'তোদের জানতে ইচ্ছে করছে না বিশেষ দিনটা কী?'

'কেন জানতে ইচ্ছে করবে না বাবা, অবশ্যই জানতে ইচ্ছে করছে। তবে আমরা এখন শুনব না।'

'কেন?'

'কথাটা শোনার জন্য আমাদের সবার বুকের ভেতর একটা বুদ বুদ আনন্দ হচ্ছে বাবা। কথাটা শুনে ফেললেই আনন্দটা শেষ হয়ে যাবে। কী দরকার শুধু শুধু আনন্দটা শেষ করে ফেলার! তার চেয়ে চলো মা'র মাছ কাটাটা উপভোগ করি।'

'চল।'

আপা চলে যেতে নিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'ও ভালো কথা, তুমি আজ অফিসে যাবে না বাবা?'

'না, আজ ছুটি নিয়েছি।'

'বাব্বাহ্! এমন কি বিশেষ দিন বাবা, একেবারে অফিস ছুটি নিয়ে ফেললে! এটা বোধহয় শুধু বিশেষ দিন না, বিশেষ বিশেষ দিন। তাই না বাবা?' মনু আপা কথাটা বলে হাসতে হাসতে বাবার দিকে তাকায়।

'আমার কাছে তার চেয়েও বেশি।'

বাবার দিকে এবার আমি এগিয়ে যাই, 'আর মা'র কাছে?'

'সেটা তোর মাকে জিজ্ঞেস কর।'

'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি বাবা।'

বাবা কিছু বলেন না। মা'র দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে থাকেন। আমিও মা'র দিকে তাকাই। মা-ও কিছুটা লাজুক লাজুক চোখে তাকিয়ে আছে

বাবার দিকে। একটু পর মাছটা নিয়ে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলে যায় মা। মা'র চলে যাওয়া দেখে মনে হয়— মা'র পা দুটোও বেশ লজ্জা পেয়েছে।

মা মাছের টুকরাটা কাটছে আর মাকে ঘিরে বসে আছি সবাই। অল্প অল্প ঘামছেন বাবা, মনু আপা খুব যত্ন করে একটা তালের পাখা দিয়ে বাতাস করছে বাবাকে। প্রায় ভেঙে যাওয়া সে পাখাটা থেকে ঝনঝন একটা শব্দ হচ্ছে, সে শব্দের তালে তালে বাবা মাথা দোলাচ্ছেন, আর গভীর মনোযোগ দিয়ে মাছ কাটা দেখছেন মা'র।

বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এই সুন্দর আয়োজন, সেটা আবার খালি মুখে দেখতে হচ্ছে, ব্যাপারটা কেমন সাদা-মাটা হয়ে যাচ্ছে না!'

মা মাছ থেকে চোখ সরিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু খাবেন আপনি ?'

'খাওয়া আর কী, এক কাপ চা হলে মন্দ হতো না, অবশ্য আমি একা খেতে চাচ্ছি না, সবার জন্যই হলে ভালো হয়।'

বটি দায়ের কাছে মাছটা রেখে মা উঠে দাঁড়াতে চাচ্ছিল, তার আগেই মিতি মাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'মা, তুমি বসো, চা আমি বানিয়ে আনছি।' মিতি আমার দিকে তাকাল, 'ভাইয়া, তুই একটু আয়তো আমার সঙ্গে।'

রান্নাঘরে ঢুকেই মিতি কিছুটা কৌতুকের স্বরে বলল, 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিস ভাইয়া ?'

মিতির দিকে আগ্রহের চোখে তাকিয়ে আমি বললাম, 'কী ?'

'বাবার কথা শুনে মা আজ কত সহজেই চা বানাতে যাচ্ছিল। অথচ অন্য কোনো দিন হলে মা কত অজুহাত দেখাত— চা পাতা নেই অথবা চিনি নেই কিংবা আর কোনো সমস্যা। কোনো কারণ নেই, মা এ সবই করত সংসারের একটু খরচ বাঁচানোর জন্য।'

'মা'র আজকের এই পরিবর্তনটা কেন বলতো ?'

'আমি জানি না।'

'আচ্ছা, আজ বাবা-মা'র ম্যারেজ ডে না তো ?'

'না, বাবা-মা'র ম্যারেজ ডে তো আরো দু মাস পর। যদিও সেদিনটা অন্যান্য দিনের মতোই কেটে যায়।'

'মা'র জন্মদিন কি আজ ?'

'দূর, মা'র আবার জন্মদিন আছে নাকি। আমাদের মায়েরা সংসারে ঢুকে সংসারের কাজ করতে করতে তাদের অতীতের সবকিছু ভুলে যায়, এভাবে ভুলতে ভুলতে একদিন তাদের জন্মদিনটাও ভুলে যায়।'

'তাহলে বাবার ?'

'বাবার জন্মদিন কবে তুই জানিস না ?'

'না তো।'

'সেটা তো গত মাসে চলে গেছে। অবশ্য তোর জানার কথাও না, আমি আর আপা কেবল জানি।'

'কীভাবে ?'

'কয়েকদিন আগে হঠাৎ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে যায় আমার। ভালো করে খেয়াল করতেই শুনি বারান্দায় বসে বাবা আর মা কথা বলছে। একটু পর মা বাবার জন্য চা বানিয়ে আনে, তারপর কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করে দুজন। টুকটাক কথাবার্তা শুনতে শুনতে হঠাৎ জন্মদিন কথাটা কানে আসে। পরের দিন মাকে জিজ্ঞেস করার পর জানতে পারি সেদিন ছিল বাবার জন্মদিন।'

'বাবাকে উইশ করিসনি ?

'আমি আর আপা মিলে করেছিলাম।'

'আমাকে একটু জানালে কি হতো ?'

'কিছুই হতো না।'

'তাহলে?'

'তোকে জানানো সম্ভব ছিল না।'

'কেন ?'

'কেন ?' মিতি আমার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলে, 'গত মাসে তুই কোথায় ছিলি তা জানি না, কিন্তু এটা তো সত্যি গত মাসে বাসায় ছিলি না।'

'তা ঠিক।' আমি একটু হাসতে হাসতে বলি, 'আগামীবার বাবার জন্মদিনটা আসার কয়েকদিন আগে আমাকে একটু মনে করে দিস তো।'

'কেন, মনে করে দিয়ে কী হবে ?'

'কিছু তো একটা হবেই।'

'আমাদের বাড়িতে হবে—।' মিতি আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে, 'না তুই সেদিন যেখানে থাকবি সেখানে হবে ?'

'এ দুই জায়গার কোথাও না, মঙ্গলগ্রহে হবে।'

মিতি হাসতে হাসতে বলে, 'মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার রিকশা ভাড়া কোথায় পাবি তুই ?'

'তুই দিবি।' আমি মিতির দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, 'তুই-ই তো আমাদের সংসারের একমাত্র আলো এখন। তোর আলোতে আমরা এখন সব পথ খুঁজে পাব, একদিন সে পথ দিয়েই মঙ্গলগ্রহে চলে যাব।'

মাথাটা নিচু করে ফেলে মিতি। একটু পর মুখ তুলে ছলছল করা চোখে বলে, 'আমাকে নিয়ে তোদের অনেক আশা, তাই না ভাইয়া ?'

'অনেক, এক সমুদ্র, না না এক মহাসাগর আশা।'

মিতি আমার বুকের সঙ্গে ওর কপাল ঠেকিয়ে কী একটা বলতে নেয় কিন্তু বলতে পারে না। আমি ওর মাথাটায় একটা হাত রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি।

লুবা কিছুটা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলে, 'বাবা বলল, চা বানাতে আর কতক্ষণ লাগবে, আমরা আজ চা খাব না আগামীকাল খাব ?'

চোখ মুছতে মুছতে মিতি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লুবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবাকে গিয়ে বল চা আমরা আজ খাব এবং এখনই খাব।'

লুবা আবার দৌড়ে চলে যেতেই মিতি কাপে চা ঢালা শেষ করে আমাকে বলে, 'বাবার আগামী জন্মদিনে আমরা একটা কিছু করব ভাইয়া। সেদিন...।' মিতি আর কিছু বলে না। আমাদের সনাতনী একটা ট্রেতে চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে মিতি রান্না ঘর থেকে বের হয়, ওর পেছনে পেছনে আমিও বের হই।

মা মাছটা নিয়ে আগের মতোই বসে আছে। আমি কিছুটা অবাক হয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার, মাছ কাটা শেষ করোনি?'

'তোর বাবা শেষ করতে দেননি।'

'কেন?'

'তোরা নেই, তোদেরকে না দেখিয়ে মাছ কাটাটা নাকি ঠিক হবে না।'

'বাবা ঠিকই বলেছে মা।' আমি বাবার পিঠের কাছে তার মাথায় চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলি, 'কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যা জীবনে খুব কম সময়েই আসে, যা কখনো মিস করা উচিত না।'

বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, 'নাও, এবার শুরু করো।'

মা খুব যত্ন করে মাছটা কাটতে শুরু করে। বাবা ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিচ্ছেন আর মাকে মাছ কাটার ডিরেকশন দিচ্ছেন— মাছটা এভাবে ধর, এভাবে কাটো, এ টুকরাটা লম্বা করে কাটো, ওটা স্কয়ার করে কাটো, আরো কত কস! বাবার প্রতিটা ডিরেকশন মা ফলো করে মাছটা কেটে ফেলল এবং অবশেষে ছোট ছোট মোট আট টুকরা হলো মাছটা।

বাবা বললেন, 'আমরা তো ছয়জন, দুই টুকরা বেশি করলে কেন মাছটা?'

মাছের টুকরোগুলো পরিস্কার করতে করতে মা বলল, 'কাজ আছে।'

'কী কাজ আছে সেটা বলা যাবে না ?'

'আপাতত না।'

লুবা একটা নতুন জামা পরেছে, কয়েকদিন আগে আপা এ জামাটা কিনে দিয়েছে ওকে। জামাটা পরে ও এ-ঘর ও-ঘর নেচে নেচে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আপা ওর গত ঈদের শাড়িটা পরেছে। অনেকদিনের পাতলা হয়ে যাওয়া একমাত্র পাঞ্জাবিটা পরেছে বাবা। রান্না শেষ করে এই মাত্র গোসল সেরে ভাঁজ করে রাখা পুরনো একটা

শাড়ি পেঁচিয়েছে মা শরীরে আর মিতি পরেছে নতুন একটা শাড়ি, ওর রেজাল্ট উপলক্ষে আজমল আঙ্কেল ও আন্টি যেটা দিয়েছেন ওকে।

মা দ্রুত শাড়িটা ঠিক ঠাক করে ডাইনিং টেবিলের কাছে এলো। মনু আপা টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে। মা মনু আপাকে বলল, 'পিরিচে দুটো মাছ আলাদা করে দে তো মা।'

মনু আপা কিছু না বলে তরকারির বাটি থেকে দুটো মাছ আলাদা করে একটা হাফ প্লেটে রাখল। প্লেটটা হাতে নিয়ে মা মিতিকে ডাকল। মিতি কাছে আসতেই প্লেটটা মিতির হাতে দিয়ে বলল, 'যা তো মা, তোর আজমল আঙ্কেলদের বাসায় দিয়ে আয়।'

মিতি খুব আগ্রহ নিয়ে আজমল আঙ্কেলের বাসার দিকে পা বাড়াতেই মা আবার ডাক দিল ওকে। মিতি ঘুরে দাঁড়াতেই মা বলল, 'একটু কাছে আয় তো।'

মা'র কাছে এসে দাঁড়াল মিতি। মা ওর থুতনির নিচে হাত রেখে মুখটা এদিক ওদিক করে দেখল। তারপর কপাল কুঁচকে বলল, 'মুখে পাওডার দিসনি ?'

'দিয়েছি তো।'

'কই দিয়েছিস ?' মা মিতির হাত থেকে মাছের প্লেটটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'যা, ভালো করে পাওডার দিয়ে আয়।'

কিছুটা বিরক্ত হয়ে মিতি বলল, 'বললাম তো দিয়েছি।'

'ভালো করে দেওয়া হয়নি, ভালো করে দিয়ে আয়, আর কপালে একটা টিপ পরিস তো।'

বিশ মিনিট পর মিতি ফিরে এলো আজমল আঙ্কেলের বাসা থেকে। মা দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কিছু বললেন ওরা?'

'না, তেমন কিছু না।'

'মাছ দুটো ওনারা খেয়েছেন ?'

'মা তুমি পাগল হয়ে গেছ! এই মাত্রই মাছ দুটো নিয়ে গেলাম, এখনই আমার সামনে খাবেন নাকি!'

'তোকে কিছু খেতে দেয়নি ?'

'আমি কবে ওনাদের বাসা থেকে না খেয়ে এসেছি ?'

'ওনারা তোকে খুব পছন্দ করে, না ?'

মিতি এ সময়টায় বেশ লজ্জা পায়। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, 'পছন্দ না করার কোনো কারণ তো দেখি না মা।'

বাবা পাশের ঘর থেকে এ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, 'আমিও তাই মনে করি, আমার প্রতিটা মেয়ের চেহারা হয়েছে রাজকন্যার মতো।'

'আর ছেলের চেহারা ?' বাবার দিকে আমি হাসি হাসি মুখ করে তাকাই।

'ছেলে হয়েছে রাজপুত্র।'

'অথচ তাদের বাবা-মা রাজাও না রানীও না।'

'তা না হোক।' বাবা বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন, 'রাজার মতো তাদের মন আছে, রানীর মতো ঐশ্বর্য আছে।'

'একদম ঠিক কথা বাবা।' মনু আপা বাবার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে, 'খাওয়ার সময় হয়ে গেছে বাবা, আমরা এখন খাব। মা, তুমি বাবার পাশে বসো।'

আমাদের ডাইনিং টেবিলটায় ছয়জন বসা যায়। খুব কষ্ট করে হলে আটজনও বসা যায়। কিন্তু মা আমাদের পাঁচজনকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা সবাই আপত্তি জানালাম, বাবা অভিমান করলেন, কোনো কাজ হলো না তাতে। মা অতি যত্ন করে আমাদের প্লেটে খাবার দিতে লাগল। তারপর বাবার পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি মুখে না দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু আপনার ছেলে-মেয়েরা মুখে দেবে না।'

বাবা আমাদের সবার দিকে তাকালেন, দেখলেন আমরা শুধু ভাত নাড়াচাড়া করছি কিন্তু খাচ্ছি না। বাবা কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাত মুখে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মুখে দিলাম। একটু পর বাবা কিছুটা শব্দ করে বললেন, 'কী, মাছটা অনেক স্বাদের, না ?'

বাবার শব্দ করে কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাইরের গেটে একটা শব্দ হয়। বাবা ডাইনিং টেবিল থেকেই বলেন, 'কে ?'

কেউ কথা বলে না। বাবা এবার আরো একটু শব্দ করে বলেন, 'কে ?'

এবারও কেউ উত্তর দেয় না। বাবা উঠে দাঁড়িয়ে গেটের দিকে এগিয়ে যান। তারপর গেটটা খুলেই কিছুটা চিৎকার করে বলেন, 'মামা!'

আমরা সবাই গেটের দিকে তাকাই। বাবা ছোটকালে যার বাসায় থেকে লেখাপড়া করেছেন বাবার সেই মামা এসেছেন। কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটছেন তিনি, বাবা তার একটা হাত ধরে আছেন। মা ঘোমটাটা ভালো করে টেনে দ্রুত দৌড়ে গেল, তারপর পায়ে হাত রেখে সালাম করতেই থমকে দাঁড়ালেন দাদু।

ঘরে ঢুকেই দাদু বললেন, 'একেবারে অসময়ে এলাম বৌমা।'

'না না ঠিক আছে মামা।' মা ঘোমটাটা আরো টেনে নিল।

'না এসেও কোনো উপায় ছিল না। আজকেই একটু ডাক্তার দেখানো দরকার। শরীরটা বেশি ভালো যাচ্ছে না।'

'আপনি খুব ভালো করেছেন।'

'গ্রামে তো অনেক ডাক্তার দেখালাম, কোনো কিছুই তো হলো না। কী করব তাও বুঝতে পারছিলাম না।'

'আপনি চিন্তা করবেন না তো মামা।'

'এদিকে হয়েছে আরেক সমস্যা, কালকে ভীষণ জরুরি একটা কাজ পড়েছে, কাল সকালেই ফিরে যেতে হবে গ্রামে।'

'সেটা পরে দেখা যাবে, আপনি এখন হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেন।'

দাদু হাত মুখ ধুয়ে আসতেই আপা উঠে দাঁড়াল প্লেটটা হাতে নিয়ে। দাদু সেখানে বসলেন। মা দাদুর সামনে একটা প্লেট দিয়ে ভাত বেড়ে দিল তাতে। তারপর বাটিতে রাখা একমাত্র মাছটা দাদুর প্লেটে তুলতেই বাবা বেশ চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার পেটে ব্যথা পেটে ব্যথা।' মা দৌড়ে গিয়ে কাছে যেতেই বাবা মুখ বিকৃত করে কাতরাতে কাতরাতে বললেন, 'আমি এখন খেতে পারব না।' তারপর হাত দিয়ে প্লেটটা সরিয়ে দিলেন সামনে থেকে।

বাবার প্লেটের দিকে তাকালাম আমি। সম্ভবত এক লোকমা ভাত খেয়েছেন প্লেট থেকে আর মাছ খেয়েছেন এক চিমটি। বাবার প্লেট থেকে চোখ সরিয়ে আপার দিকে তাকাতেই দেখি, আপাও তাকিয়ে আছে বাবার প্লেটের দিকে, ছলছল করছে আপার চোখ দুটো।

বিকেলের সোনালির রোদের এক টুকরো ঘরে এসেছে আমার। আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি, আমার চোখে মুগ্ধতা। এ মুগ্ধতা অন্য এক কারণে।

আমাদের রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট্ট কদম ফুল গাছ আছে। কিছুক্ষণ আগে আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। মা রান্নাঘরে কাজ করছিল, এঁটো বাসন-কোসন ধুচ্ছিল এক মনে। খুব নিঃশব্দ পায়ে এ সময় রান্নাঘরে ঢোকে বাবা। মা চমকে উঠে বলে, 'আপনার পেটের অবস্থা কেমন?'

বাবা হাসতে হাসতে বলে, 'আমার পেটে তো কিছু হয় নাই।'

'তখন যে বললেন?'

'মিথ্যা বলেছিলাম।'

'আপনি তো কখনো মিথ্যা বলেন না।'

'বলি না, আজ বলেছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি।'

'আপনি কেন এ মিথ্যাটা বললেন?'

বাবা কিছু বলেন না। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমাদের রান্নাঘরের ভেতরটা দেখা যায়। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ভেতরটা দেখছি। বাবা পেছন থেকে ডান হাতটা সামনে আনেন, তার হাতে সেই খাবারের প্লেটটা। প্লেটে সেই ভাত, সেই মাছের টুকরা।

একটু এগিয়ে গিয়ে বাবা মা'র একটা হাতে ধরে বলেন, 'আজকের দিনটার কথা তোমার মনে আছে ?'

'এটা কি ভুলে যাওয়ার কথা ?'

'সব মনে আছে তোমার ?'

'সব।'

'পঁচিশটা চিঠি দেওয়ার পর এ দিনটায় তুমি আমার একটা চিঠির জবাব দিয়েছিলে...।'

'ঠিক পঁচিশ বছর আগে।'

'তারপর এই আমরা।'

'আপনি কী একটা জিদ ধরেছিলেন— পঁচিশটা চিঠির পর জবাব পাওয়া, তারপর আর কোনো কিছু না, পঁচিশ বছর পর এ দিনটাকে একটাবারের জন্য মনে করা। কী পাগলামি!'

'শুধু পাগলামি ?'

'না, হাস্যকরও।'

'আর কিছু না ?'

মাথাটা নিচু করে ফেলে মা। বাবা রান্নাঘরের মাঝে একটা মাদুর বিছিয়ে জোর করে মাকে সেখানে বসিয়ে নিজেও বসে পড়েন। তারপর সেই প্লেটটা মা'র দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'খাও।' একটু থেমে বাবা বলেন, 'তখন যদি আমি খেতে থাকতাম, তাহলে এ মাছটাও আমি খেয়ে ফেলতাম। অথচ মাছটা আনা হয়েছিল কেবল তোমার জন্য।'

বাবা ভাত মাখিয়ে মাছের একটা টুকরা নিয়ে মা'র মুখের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেন, মা বেশ লজ্জায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক করে বাবার হাতের লোকমাটা মুখে পুরে নেয়, তারপর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাবার দিকে। মা'র চোখ দিয়ে একটু পর পানি পড়তে থাকে। টপ টপ করে মা'র গাল বেয়ে পানি পড়ছে আর তা দেখে মিটিমিটি হাসতে থাকেন বাবা।

বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে ঠাঁই নিয়েছে বাবা আর মা'র মাঝখানে। তাদের দেখে এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে— তারা এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মমতাময় মানুষ, এমন কি স্রষ্টার চেয়েও মমতাময়!

বিস্মিত চোখে আমি সামনের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেললেন মহিলাটি। তারপর আমাকে আরো বিস্মিত করে বললেন, 'অবাক হয়েছ ?'

'কিছুটা।'

'কিছুটা না, অনেক হয়েছ। কি, ঠিক ?' ঝনঝন করে হেসে উঠলেন মহিলাটি।

আমি চোখ দুটো নিচু করে বললাম, 'ঠিক।'

'আচ্ছা, তুমি কি মাইন্ড করেছ ?'

'কেন ?'

'এই যে তুমি করে বললাম তোমাকে।'

'তুমি করে বলাটাই কি উচিত না ?'

'উচিত। কারণ নাও আই অ্যাম ফিফটি থ্রি।' মহিলাটি আবার হেসে উঠলেন। আমি আরো মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাকে দেখে। একদম মেপে মেপে কথা বলছেন তিনি। এতে তার ঠোঁট দুটো নড়ছে কি নড়ছে না, তা বোঝা যাচ্ছে না। কেবল বোঝা যাচ্ছে তার ঠোঁট দুটো একটু রঙ করা, যতটুকু করলে কোনোক্রমেই সামান্যও বাড়াবাড়ি মনে হয় না ঠিক ততটুকু, ভ্রু দুটো চিকন হয়ে বেঁকে গেছে, নাকটা তরতরে লম্বা, চোখ দুটো সবসময় হাসিময়, কেবল...কেবল তার মাথার চুলগুলো একদম ছেলেদের মতো কাটা, আর একটা জিনিস ছেলেদের মতো— তার মাথার সামনের দিকের সম্পূর্ণ অংশ প্রায় টাক হয়ে গেছে। তারপরও একটা কথা স্বীকার না করলে অতি অন্যায় হয়ে যাবে, তা হলো— তার মতো এত সুন্দরী মহিলা সামনা-সামনি আমি এ জীবনে আর একটিও দেখিনি!

মহিলাটি আবার যথারীতি শব্দ করে হেসে হেসে বললেন, 'আই অ্যাম ফিফটি থ্রি, কিন্তু ফোনে কিংবা মোবাইলে আমার গলা শোনায় টিনএজের মতো, রাইট ?'

আমিও এবার হেসে হেসে বললাম, 'রাইট।

'আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছি, কিন্তু আমরা এখনো দুজন দুজনের নাম জানি না। শুভ সন্ধ্যা—।' মহিলা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'আমি জিনিয়া সামাদ।'

সংকোচে নুয়ে পড়া হাতটা আমি কোনো রকমে এগিয়ে দিলাম জিনিয়া সামাদের দিকে, 'আমি দন্ত্যন।'

কপাল কুঁচকে পরক্ষণেই চোহারাটা স্বাভাবিক করে তিনি বললেন, 'দন্ত্যন! মানে কী এ নামের ?'

'কোনো মানে নেই।'

'কে রেখেছে এ নামটা ?'

'আমি নিজেই।'

'তুমি নিজেই রেখেছ!' বড়দের কোনো কৌতুক শোনার মতো একটু চেপে হেসে তিনি বললেন, 'তা তোমার বাবা-মা কী নাম রেখেছিলেন ?'

'আপাতত সেটা না বললে কি কোনো ক্ষতি হবে ?'

'মোটেই না।'

'সেটা তাহলে থাক।'

'থাক।' জিনিয়া সামাদ দু'হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলেন, 'আমরা কি কোথাও কফি খেতে পারি?'

'আমাদের তাহলে একটা রিকশা নিতে হবে।'

'নেব।' জিনিয়া সামাদ একটু এগিয়ে নিতেই আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটা কথা।'

আমি একটু সিরিয়াস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বলুন।'

'কোনো অবস্থাতেই তুমি কফির দাম দেওয়ার চেষ্টা করবে না এবং তা করলে তোমার ভয়ানক অন্যায় হবে। কথাটা মনে থাকবে?'

মাথা নিচু করে আমি বললাম, 'থাকবে।'

কফি হাউসে ঢুকেই তিনি আমাকে খুব ইম্পর্টেন্সি দিয়ে বললেন, 'হোটেলের সাধারণত কোন জায়গাটায় বসতে তুমি পছন্দ করো?'

আমি কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, 'মানে?'

'তুমি কোনার কোনো জায়গাতে বসবে, না মাঝখানের কোনোখানে বসবে?'

'এক জায়গায় বসলেই হয়।' আমি জিনিয়া সামাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি কোথায় বসতে পছন্দ করেন?'

'এ মুহূর্তে তুমি যে জায়গায়টায় বসবে, সে জায়গাটাই আমার পছন্দ।' জিনিয়া সামাদ হাসতে থাকেন।

কফি হাউসের ডান পাশের জায়গাটাতে বসলাম আমরা। তিনি ওয়েটারকে কফির অর্ডার দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আগের মতোই আমাকে প্রাধান্য দিয়ে বললেন, 'চিকেন আমার খুব পছন্দ, তোমার?'

'আমার কোনো পছন্দ নেই।'

'কেন!' মমতা মিশ্রিত স্পর্শে তিনি আমার ডান হাতটা ছুঁয়ে বললেন, 'সবারই কিছু না কিছু পছন্দ থাকা উচিত।'

জিনিয়া সামাদের দিকে আমি পূর্ণ চোখে তাকিয়ে বললাম, 'পছন্দের ব্যাপারটা সম্ভবত তাদের জন্যে, যাদের সামনে অনেক কিছু থাকে। যাদের কোনো কিছুই নেই, তারা...।'

হাত দিয়ে ইশারা করে জিনিয়া সামাদ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি জানি। তারপরও একটা পছন্দ নিয়ে, একটা সখ নিয়ে, একটা ইচ্ছা নিয়ে প্রতিটি মানুষের এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

'সে রকম সখ বা ইচ্ছা বোধহয় আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই আছে, সে এক চিরাচরিত ইচ্ছা— প্রতিদিন এ পেটটা ভরানোর ইচ্ছা।'

জিনিয়া সামাদ একটু গভীর চোখে আমার দিকে তাকান। আমিও হাসি হাসি মুখ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু পর আমি টের পাই এক ধরনের বিষাদ এসে ভর করেছে জিনিয়া সামাদের চোখে, চোখ দুটো টলটল করছে তার। একটু পর তিনি আমার হাতটা চেপে ধরে বলেন, 'মাই সান, দেশের বাইরে থেকে আমরা কেবল শুনেই যাই, কখনো বুঝতে পারি না প্রতিদিন কত মানুষ না খেয়ে থাকে এ দেশে, কত মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করে!'

'দেশের বাইরে আপনি কোথায় থাকেন ?'

'জার্মানিতে।'

'আর কে কে থাকে ?'

জিনিয়া সামাদ হেসে ফেলেন, কিন্তু হাসিটা ঠিক আনন্দময় মনে হয় না, কোথায় যেন একটা দুঃখ লুকিয়ে আছে এ হাসিতে। সে দুঃখ মেশানো হাসি নিয়েই তিনি বলেন, 'আমার একটা ছেলে আছে, তোমার বয়সী।'

'ও কী করে ?'

'পড়াশোনা করে।' জিনিয়া সামাদ বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাকে বলেন, 'তোমার পড়াশোনাও তো বোধহয় এখন শেষ হয়নি, তুমি কী পড়ছো এখন ?'

কিছুক্ষণ থেমে থেকে আমি আমি বলি, 'পড়াশোনা আমি বাদ দিয়েছি।'

'বাদ দিয়েছ মানে ? তোমার কি লেখাপড়া শেষ হয়ে গেছে ?'

'না, তবে আমি শেষ করে দিয়েছি।'

'কেন ?' কেমন যেন চমকে উঠে জিনিয়া সামাদ বলেন।

'একটা কারণ আছে।'

'কারণ আছে!'

'জি, গভীর একটা কারণ আছে।'

জিনিয়া সামাদ দু'হাত দিয়ে আবার আমার একটা হাত চেপে ধরে খুব কাতর গলায় বলেন, 'আমাকে বলা যাবে কারণটা ?'

'এ মুহূর্তে ঠিক বুঝতে পারছি না বলা যাবে কিনা, যদিও এখনো কাউকেই বলিনি কারণটা ?'

'তাহলে থাক।' আমার হাতটা আরো একটু জোরে চেপে ধরে জিনিয়া সামাদ বলেন, 'আচ্ছা, এবার কি আমাকে বলবে আমার এ মোবাইলটা তুমি কোথায় পেলে ?'

'ফুটপাতের পাশে একটা গাছের নিচে পেয়েছি।'

'ও বুঝেছি।' জিনিয়া সামাদ একটু সোজা হয়ে বসে বলেন, 'সেদিন কোথায় যেন যাচ্ছিলাম রিকশা করে। আমার হাতে একটা ব্যাগ ছিল, ব্যাগের সঙ্গে একটা কাভারে আটকানো ছিল মোবাইলটা। তারপর কী হয়েছিল জানো ?'

'কী ?'

'কোথা থেকে একটা ছেলে এসে আমার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে ঝেড়ে দৌড় লাগায়। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেক দূরে চলে যায় ছেলেটা। ব্যাগটা নিয়ে দৌড়াতে গিয়েই মোবাইলটা হয়তো রাস্তার পাশে পড়ে গিয়েছিল, যা ছেলেটি টের পাইনি।'

'কিন্তু আপনি এতদিন পর মোবাইলটার খোঁজ নিলেন যে!'

'সেদিন রাতেই আমার ফ্লাইট ছিল, তাই খোঁজ নিতে পারিনি। এবার দেশে ফিরেই মনে হলো একটু খোঁজ নেই। ভাগ্যিস মোবাইলের নাম্বারটা নোটবুকে লিখে রেখেছিলাম।' জিনিয়া সামাদ কফিতে চুমুক দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, সাত্তার সাহেব তোমার কে হন ?'

'কেউ না।'

'মোবাইলটা তো তার কাছে ছিল।'

'আমি রেখে দিয়েছিলাম। আপনি যখন তার সঙ্গে কথা বলেন তার একটু পরেই আমার কাছে পৌঁছে দেন মোবাইলটা।'

'জানো।' চোখ ছলছল করলেও জিনিয়া সামাদ বলেন, 'দেশের বাইরে থেকে দেশের কত বদনাম শুনি, দেশে নাকি একটাও ভালো মানুষ নেই, সব মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে।'

'এখন কী মনে হচ্ছে আপনার ?'

'না, সবাই নষ্ট হয়ে যায়নি। এখনো কিছু মানুষ ভালো আছে।'

'কিছু মানুষ না, অধিকাংশ মানুষ।'

আমার প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে আমি জিনিয়া সামাদের হাতে দেই। তিনি হাতে নেন বটে, কিন্তু একবার ফিরেও তাকান না জিনিসটার দিকে। খুব মায়া দিয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেন, 'আমার ছেলেটা না এখন আর আমার নেই।'

আমি একটু ঝুঁকে বসে বলি, 'মানে ?'

'ও এখন ওর বাবার কাছে থাকে।'

'আপনাদের—।'

কথাটা শেষ করার আগেই জিনিয়া সামাদ ম্লান হেসে বলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।' চোখ দুটো ভিজে উঠেছে জিনিয়া সামাদের, কিন্তু তিনি হাসছেন। সে কান্না-হাসির মুখ নিয়েই তিনি বলেন, 'জানো, প্রতিদিন সকালে আমি আমার বাসার দরজা খুলি একটা আশা নিয়ে। আমি জানি আমার এ আশাটা একদিন পূরণ হবেই। একদিন দরজা খুলতেই দেখব— আমার ছেলেটা অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্যে। আমাকে দেখেই আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে

অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকবে, তারপর সমস্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে বলবে— মাম, মাই ডিয়ার মাম, তুমি কেমন আছো ?' বুকের ভেতর থেকে গরম একটা বাতাস বের করে দেন জিনিয়া সামাদ, তারপর আমার হাত দুটো পরম মমতায় চেপে ধরে করুণ স্বরে বলেন, 'বলতে পারো, আমাকে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ?'

বাসায় ফেরা হবে না আজ, ইচ্ছেও করছে না আমার। সারা রাত আজকেও ঘুরে বেড়াব, যেখানে মন চায় সেখানেই হেঁটে হেঁটে চলে যাব আমি। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বুঝতে পারছি না।

মোবাইলটা বেজে ওঠে হঠাৎ। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে এ যন্ত্রটা নিয়ে। একটু পরপরই কোথা থেকে যেন মিসড কল আসে! আমি যে কল ব্যাক করব, সে সামর্থ্য কি আমার আছে ? কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমাকে কে মিসড কল দেবে।

জিনিয়া সামাদ মোবাইলটা নিয়ে যাননি, দিয়ে গেছেন আমাকে। আমার প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও তিনি মোবাইলটা আমার হাতে দিয়ে চেপে ধরে বলেছিলেন, 'জার্মানি থেকে আমি তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলব, তুমি বিরক্ত হবে না তো ?'

'একটুও না।'

হেসে হেসে জিনিয়া সামাদ বললেন, 'কেন বিরক্ত হবে না ?'

তার মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আমি বলেছিলাম, 'তা তো জানি না।' বলেছিলাম বটে, তবে আমি জানি একজন প্রকৃত মা তার ছেলের বয়সী সবাইকে ছেলেই মনে করেন। জিনিয়া সামাদের চোখ আমি দেখেছি, আমি এও জানি তিনি আমাকে কোন চোখ দিয়ে তাকিয়েছেন। পৃথিবীর সব মায়ের চাহনি যে একই, এটা কে না জানে!

মোবাইলটা আবার বেজে ওঠে। কিন্তু এবার মিসড কল না। অনেকক্ষণ বাজতে থাকে মোবাইলটা। অগত্যা ফোনটা রিসিভ করলাম। ওপাশ থেকে খুব আনন্দিত গলায় একটা মেয়ে বলল, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন ?'

আমি বললাম, 'না।'

'চিনতে পারেননি!'

'বললাম না, না।'

'আপনি মিথ্যা বলছেন।'

'আপনি কী করে বুঝলেন আমি মিথ্যা বলছি।'

'আমার গলা আপনার চেনার কথা।'

'তাই ?'

'তাই না তো কি ?'

'আমি সত্যি আপনার গলা চিনতে পারছি না। কারণ প্রতিটা মেয়ের গলাই আমার কাছে লতা মুঙ্গেশকরের গলার মতো মনে হয়।'

'লতা মুঙ্গেশকর আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন নাকি ?'

'না তো।'

'তাহলে ওনার গলা চেনেন কী করে আপনি ?'

'কী করে চিনি ?' আমি একটু থেমে বলি, 'প্রতিটা মেয়ের গলাই তো এক— মায়াময়, রহস্যময়, শান্তিময়। যেমন আমার মায়ের গলা, যেমন আপনার গলা। কি, ঠিক বলেছি, কবিতা?'

'অ, আপনি আমাকে চিনেছেন ?'

'কবিতা, আপনাকে কি ভোলার কথা, আপনি তো কবিতা। আচ্ছা, শেপু আপা কেমন আছে ?'

'ভালো।'

'নিলয় ?'

'নিলয়ও ভালো।'

'আর আপনি ?'

'আমি ?' কবিতা একটু হেসে বলেন, 'কবিতারা কখনো খারাপ থেকেছে দেখেছেন ?'

'খুব বেশি যে কবিতাদের দেখা হয়নি।'

'সত্যি দেখা হয় নি ?'

'দেখা হয়নি সেটা বলব না, দেখতে চাইনি।'

'দেখতে ইচ্ছে করে না ?'

'আপাতত না।'

কথা বলতে বলতে শাহবাগের মোড়ে এসেছি। হঠাৎ দেখি ওপাশ থেকে পলক, বিপ্লব আর রিছিল আসছে। আমাকে দেখেই পলক প্রায় দৌড়ে এসে বলল, 'একটা সুখবর আছে দোস্ত।'

'সুখবর!' আমি পলকের একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'সুখবর সব সময় শোনা যায়, সুতরাং সুখবরটা একটু পরে শুনি। তার আগে বলো, তোমরা কেমন আছো ?'

পলক জবাব দেওয়ার আগেই বিপ্লব বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, 'আমরা ভালো আছি, তুমি ?'

'তোমাদের মতোই।'

রিছিল একটু এগিয়ে এসে অতর্কিতভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'একটা কৃতজ্ঞতা, একটা ধন্যবাদ জানানোর জন্য তোমাকে খুঁজছি।'

'আমার মনে পড়ছে না আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু করেছি যার জন্য কৃতজ্ঞতা কিংবা ধন্যবাদ পেতে পারি।'

'তুমি কিছুই করোনি, কেবল আমাদের জীবনধারাটা পাল্টে দিয়েছ।'

'আমি! আমি তোমাদের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছি?' হাসতে হাসতে আমি বলি, 'হাসালে আমাকে, যে তার নিজের জীবনই পাল্টাতে পারে না, সে আবার পাল্টাবে অন্যের জীবন!'

'নদীও কখনো তার নিজের জীবন পাল্টাতে পারে না, কিন্তু সে যে জায়গা দিয়ে বয়ে যায় পাল্টে যায় সে জায়গাটা।'

'আমি কি নদী?'

রিছিল আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'প্রতিটি মানুষই একেকটা নদী, নিরন্তর তার বয়ে চলা, প্রতিনিয়ত তার ছুটে চলা।'

পলকের দিকে তাকিয়ে আমি বলি, 'এবার সুখবরটা বলো।'

'রিছিলের আজ জন্মদিন।'

'সত্যি!' রিছিলকে এবার আমি জড়িয়ে ধরি, 'শুভ জন্মদিন বন্ধু।'

'কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে দন্তন্য।'

'কী সমস্যা?'

'এ দিনটাকে একটু সেলিব্রেট করা দরকার, কিন্তু কোনো টাকা-পয়সাই নেই আমাদের পকেটে।'

রিছিল কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আমি ওকে হাত দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আজকের টাকা আমি যোগাব। তোমাদের যে কাজ থেকে ফিরিয়ে এনেছি, আমি আজ সে কাজটা করব।'

'তুমি ছিনতাই করবে!' বিপ্লব যেন আকাশ থেকে পড়ে।

'হ্যাঁ, এটাই প্রথম এটাই শেষ এবং ছিনতাইটা করা হবে অন্যরকম এক ছিনতাইকারীদের কাছে থেকে।'

'এটার কি দরকার আছে দন্তন্য।' রিছিল খুব আন্তরিকভাবে আবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

আমি রিছিলের দুটো হাত একসঙ্গে চেপে ধরে বলি, 'আমার অনেকদিনের শখ এরকম একটা কাজ করার। প্লিজ, তুমি না করবে না।'

রমনা পার্কের কাছাকাছি এলেই সোমার কথা মনে পড়ে যায় আমার। এখানে বসেই ও কাঁদছিল, তিনজন পুলিশ ওর টাকা কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, পরিচয় হয়েছিল।

বিপ্লব আমাকে বেশ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কেন?'

'কাজটা যে করতে হবে এখানেই।'

'এখানে রাতে তো তেমন মানুষজন আসে না।'

'পুলিশ আসে।'

'তুমি পুলিশের কাছ থেকে—।' এটুকু বলেই পলক থেমে যায়। আমি পলকের অবাক হওয়া চেহারাটা দেখে মুচকি হাসি। তারপর ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলি, 'হ্যাঁ, পুলিশের কাছ থেকেই।'

কথাটা শেষ না হতে না হতেই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনজন পুলিশ এদিকে এগিয়ে আসছে। আমি রিছিলকে বললাম, 'তোমরা সবাই পকেটে হাত ঢুকাও।' সবাই পকেটে হাত ঢুকাল। আমি ওদের পকেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হাতটা পকেটে এমনভাবে রাখো যেন বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে তোমাদের পকেটে কিছু আছে।'

পুলিশ তিনজন একেবারে সামনে চলে এসেছে। আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেললাম। তারপর সে পুলিশ তিনজনকে উদ্দেশ করে শব্দ করে একটা সালাম দিলাম, 'আসসালামু ওলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।'

পুলিশ তিনজনের একজনও সে সালামের উত্তর দিল না, এমনকি একটু থামলও না। তারা পাশ কেটে যেতে নিতেই আমি বললাম, 'একটা কথা ছিল আপনাদের সঙ্গে।'

থেমে গেল তারা। লম্বা ধরনের পুলিশটি বলল, 'কী কথা?'

'আপনারা কি কানে কম শোনেন?'

'কানে কম শুনব কেন?'

'সালামের উত্তর দিলেন না যে।'

লম্বা পুলিশটি এবার একটু রেগে গিয়ে বলল, 'কি, সালামের উত্তর দিতেই হবে নাকি?'

'জি।'

'কেন?'

'কারণ কেউ সালাম দিলে সে সালামের উত্তর দিতে হয়। তাছাড়া—।' আমার পাশে দাঁড়ানো বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'ওকে চেনেন আপনি?'

'ও কে যে ওকে চিনতে হবে।'

'ও কে?' আমি একটু পুলিশটির দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ওর মামা হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সচিব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চেনেন তো?'

নিমিষেই কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল পুলিশের মুখটা।

আমি গলাটা আরো গম্ভীর করে পলককে দেখিয়ে বললাম, 'ও হচ্ছে চিফ হুইপের একমাত্র ছেলে।' রিছিলের দিকে তাকালাম এবার, 'ওর পরিচয়টা কি দেওয়ার দরকার আছে ? ঠিক আছে দিচ্ছি, ও হচ্ছে ভাইয়ের ভাই। এ এলাকার ভাইকে চেনেন তো ?'

কাঁপা কাঁপা গলায় পুলিশটি বলল, 'জি।'

'গুড, ও একটা কাজ খুব ভালো পারে। ও খুব সুন্দর করে মানুষের গলা কাটতে পারে। ওই যে কয়েকদিন আগে তিনটা গলাকাটা মানুষের ছবি দেখেছেন না পেপারে ?'

'জি।'

'এবার আসল কথায় আসি। এ পর্যন্ত কত টাকা কামাই হয়েছে আপনাদের?'

'আপনার কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝতে পারেননি! আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি— এই ধরুন রাস্তার মেয়েদের কাছ থেকে, কোনো রিকশাওয়ালার কাছ থেকে, বাস-ট্রাক থামিয়ে...। আরো বলতে হবে?' আমি একটু থেমে বলি, 'আমাদের কিছু টাকা দরকার, এই ধরুন হাজার খানেক। আছে ?'

পুলিশটা কিছু বলে না। কিন্তু পাশ থেকে বিপ্লব একটু এগিয়ে এসে বলে, 'মাত্র এক হাজার টাকা। সারা রাত বিভিন্ন ধান্ধাবাজিতে টাকাটা কামাই করা আপনাদের কাছে কিছুই না। ভাইকে কি একটা ফোন দেব ?'

তিনজন পুলিশ কিছু বলে না। প্রায় এক সঙ্গে নিজেদের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু টাকা বের আমার হাতে দিয়ে বলে, 'সাতশ' আছে।'

আমি বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে বলি, 'চলবে ?'

বিপ্লব চোখ দিয়ে ইশারা করতেই আমি আবার পুলিশদের সালাম দেই। এবার আর তারা চুপ করে থাকে না। আমার মতোই স্পষ্ট করে তারা সালামের উত্তর দেয়।

ধানমণ্ডি লেকের পাশে বিরিয়ানি খেতে খেতে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রিছিল। মাঝরাতে ওর এরকম কান্না দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। আমি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে বলি, 'কী হয়েছে, রিছিল ?'

রিছিল কিছু বলে না। কেবল 'মা মা' করতে করতে লেকের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ি। তারপর নিথর নিস্তব্ধতায় রিছিলের সঙ্গে ওর মাকে খুঁজতে থাকি। খুঁজতে খুঁজতে রিছিল কাঁদে, আমরাও কাঁদি। অবারিত জ্যোৎস্না নিয়ে সে কান্না শুনে থমকে দাঁড়ায় বুড়ো হয়ে যাওয়া চাঁদটা— কেবল ঘটনার সাক্ষী হয়ে!

ঘুমের মাঝেই আমি টের পেলাম কে যেন আমাকে ডাকছে। আস্তে আস্তে চোখ মেললাম আমি। সমস্ত আকাশটা আমাকে ঘিরে আছে, সে আকাশে আবার অনন্ত নক্ষত্ররাজি।

কাওরানবাজারের ফুটপাতে তরি-তরকারি বয়ে নিয়ে যাওয়া বাঁশের টুকরির মধ্যে শুয়ে আছি আমি। পাশ ফিরে তাকালাম আমি এবং চমকে উঠলাম। চৈতী দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে, ও আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হওয়া হাসি হাসছে।

খুব দ্রুত আমি উঠে দাঁড়িয়ে চৈতীর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনি ?'

'চিনতে পেরেছেন আমাকে ?'

'সব মুখ ভুলে যাওয়া যায়, তবে কিছু কিছু মুখ বাদে।'

'আমার মুখটা কি সেই কিছু কিছু মুখ ?'

চৈতীর দিকে আমি গভীরভাবে তাকালাম। অল্প অল্প কালো হয়ে গেছে চোখের নিচে, কোথাও একটা লাবণ্যর ঘাটতি হয়ে গেছে ওর চেহারায়। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'এত রাতে!'

'আপনি সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ান, আর আমি ঘুরে বেড়াই গাড়িতে।'

'কেন ?'

চৈতী হাসতে হাসতে বলে, 'আপনি যে কারণে ঘুরে বেড়ান।'

'আমি কী কারণে ঘুরে বেড়াই আপনি জানেন ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'তাহলে আর কী।' চৈতী আবার হাসতে থাকে, 'কতদিন আপনাকে ফোন করেছি।'

'স্যরি, ফোনটা সাত্তার ভাইয়ের কাছে ছিল।'

'এখন কি আপনার কাছে ?'

'জি।'

'চলুন, আজ আপনাকে আমি খাওযাব।'

'কোনো উপলক্ষ ?'

চৈতী মাথাটা নিচু করে আবার তা তুলে আমার দিকে তাকায়। চোখ দুটো কুঁচকে কী যেন দেখে। তারপর সামনে নেমে আসা মাথার চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে বলে, 'কোনো উপলক্ষ-টপুলক্ষ কিছু না, একটা কারণ আছে।' চৈতী মাথাটা আবার নিচু করে ফেলে বলে, 'আমার বাবা খুব খেতে পছন্দ করতেন। কিন্তু বাবার গলায় একটা অপরেশন হয় একবার, তারপর বাবা আর মুখ দিয়ে খেতে পারতেন না। বাবার গলার পাশে একটা ছিদ্র করে দেওয়া হয়, বাবাকে খাওয়াতে হতো সেই ছিদ্রতে নল ঢুকিয়ে।' চৈতী আবার মুখ তুলে তাকায়, 'অথচ কি জানেন-বাবা আমার আর মা'র জন্য যা রেখে গেছেন, তা দিয়ে অন্তত আমরা একশ' বছর বসে খেতে পারব।'

'রেখে গেছেন মানে ?'

'গত সপ্তাহে বাবা মারা গেছেন!'

মিতি ফোন করেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ভাইয়া, আপাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তুই কি একটু আসতে পারবি ?'

'কী হয়েছে আপার ?'

'আমি বলতে পারব না।'

'এত রাতে আপাকে হাসপাতালে কে নিয়ে এসেছে ?'

'আমি একাই নিয়ে এসেছি, যদিও মা আসতে চেয়েছিল।'

'বাবা আসেনি ?'

'সারাদিন অফিস করে বাবা ঘুমিয়ে আছে, বাবাকে তাই জানানো হয়নি, আর মা-ও চাচ্ছিল না বাবা ব্যাপারটা জানুক।'

'আপার কী হয়েছে বলবি তো ?'

'আমি কিচ্ছু জানি না ভাইয়া, তুই একটু তাড়াতাড়ি আয়।'

মিতি ফোনটা রেখে দিল। আর আমি হাইকোর্টের মাঝারের পাশে নিজেকে একা করে ফেলি, সত্যিকারের একা। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মিতি একটা চিঠি দিয়েছিল আমার হাতে। পকেটে হাত দিয়ে সে চিঠিটা বের করি এবং আবার পড়তে থাকি।

ভাইয়া

কেন জানি মনে হয় এ চিঠিটা পড়ার পর পরই তুই বাসা থেকে বের হয়ে যাবি এবং যথারীতি আজও বাসায় ফিরবি না, হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াবি সারারাত।

লিওন ভাইয়া আমাকে একটা চিঠি লিখেছে। চিঠিতে কী লিখেছে জানিস ? উনি যেখানে থাকেন ওখানে ওনার একজন পছন্দের মেয়ে আছে। আর বেশি কিছু উনি লেখেননি। কেবল চিঠির শেষে লিখেছেন আমি যেন ভালো থাকি।

আচ্ছা, তোর কি মন খারাপ হয়ে গেল ভাইয়া ? একদম মন খারাপ করবি না। একটা কবিতা শুনবি ? বলি ?

এ প্রান্তরে তোমার ঠাঁই নেই বালিকা
তাতে কী!
সমস্ত পৃথিবী আছে তোমার অপেক্ষায়।

মনটা ভালো হলো এখন ? আমার মনটা এখন অনেক ভালো রে ভাইয়া। ইচ্ছে করছে আকাশের চাঁদটা এনে তেল দিয়ে ভেজে খাই। হা-হা-হা-।

হাসপাতালে গেটে ঢুকতেই দেখি মিতি উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে গেটের দিকে। আমাকে দেখে দৌড়ে এসে হাত চেপে ধরে বলল, 'তুই আমাকে কথা দে ভাইয়া আজ সারারাত তুই আপার পাশে থাকবি।'

মিতি কথা বলছে আর কাঁদছে। আমি ওর মাথাটা আমার বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বলি, 'থাকব।'

সাদা একটা চাদর গায়ে দিয়ে আপা শুয়ে হাসপাতালের সাদা বিছানায়। দু'চোখের ওপর একটা হাত চাপা দেওয়া। আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে আপার সে হাতের ওপর আমার একটা হাত রাখি। কিছুটা চমকে উঠে আপা আমার দিকে তাকিয়ে ম্লান একটা হাসি দেয়। তারপর উঠে সোজা হয়ে বসে বলে, 'জিজ্ঞেস করবি না আমার কী হয়েছে ?'

'সম্ভবত আমি জানি।'

বেশ শংকিত গলায় আপা বলে, 'জানিস!'

'জানি তো সেই অনেক আগেই। ইন্টার পরীক্ষার ফিস ছিল না আমার, বাবা যোগাতে পারেনি। সেই ফিস যোগাতে তুমি গিয়েছিলে বদিউল আঙ্কেলের বাসায়। সর্বনাশের শুরুটাটা সেই সেদিন থেকেই।'

'তারপর থেকে তুই আর আমার দিকে ভালো করে তাকাস না। এভাবে তোর ফিস যোগার করেছিলাম বলে তুই পরীক্ষাটাও দিসনি। আমাকে দেখলেই তুই কেমন যেন হয়ে যাস, বাসায় মন টেকে না তোর, ঘুরে বেড়াস এখানে ওখানে। একটা কথা বলবিরাত-বিরাতে এভাবে ঘুরে ঘুরে তুই কী খুঁজিস?'

'নিজেকে।'

'এখনো পাসনি ?'

'না, সবখানেই শূন্যতা।'

বুকের ভেতরটা কেমন যেন গরম হয়ে ওঠে আমার। আপার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। সঙ্গে সঙ্গে খপ করে আবার হাতটা ধরে ফেলে আপা। তারপর হাতটা টেনে নিয়ে নিজের গালের সঙ্গে ঠেকায়, ওর চোখের জল গাল বেয়ে আমার হাতে এসে থামে।

'সারা জীবন কষ্ট করে যাওয়া বাবা আর মাকে দেখে আমি সবাইকে সুখী দেখতে চেয়েছি রে। তুই একদিন মানুষ হবি, মিতি অনেক বড় হবে, লুবা তোদের ছায়ায় আনন্দ নিয়ে নিজের জীবনটা গড়ে নেবে, আর তোদের দেখে বাবা-মা প্রতিদিন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যাবে, তারপর সুখী সুখী চেহারা করে ঘুম থেকে জেগে উঠবে সকালে।'

'সেখানে তুমি কই ?'

'আমি সেখানে নাই বা থাকলাম।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি আমি। তারপর মাথাটা নিচু করে বলি, 'তোমার ভেতরে যে অশুদ্ধ ভ্রূণটা রয়েছে, তুমি যে সেটা আজ নষ্ট করতে যাচ্ছো, বদিউল আঙ্কেল কি সেটা জানেন ?'

দরজায় শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি মোখলেস ভাই দাঁড়িয়ে, তার হাতে দুটো রক্তের ব্যাগ। আমাকে দেখে মাথাটা নিচু করে ফেলেন তিনি। আপার হাত ছেড়ে দিয়ে আমি বাইরে বের হয়ে আসি।

মিতি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে কিছুটা খামচে ধরে কাতর গলায় বলে, 'ভাইয়া, তুই কি চলে যাচ্ছিস ?'

আমি বলি, হ্যাঁ।'

কিছু বলে না আর মিতি। আস্তে করে আমাকে ছেড়ে দেয় ও। আমি হাসপাতালের সিঁড়ি বেয়ে ক্লান্ত পায়ে নেমে আসি।

সারা রাত আজ আমি হাঁটব এবং অনেকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব স্রষ্টাকে। পরক্ষণেই ভাবি, কী দরকার! কী দরকার আমাদের এই জটিলতার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে, তিনি ভালো আছেন, ভালো থাকুক তিনি। আমি তো জানি, হোক হাজার জটিলতা, যতই পালিয়ে বেড়াই, তবুও একদিন এসবের সম্মুখীন হতে হবে আমাকে।

কোনো কোনো রাতে আমি সত্যিকারের আমি হয়ে যাই। আজ আমি সেই আমি হয়ে যাব। কোনো সবুজ ঘাসের মাঠে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকব আমি, অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ।

তারপর ?

তারপর সারারাত কাঁদব। সে কান্না জলে আমি ঘাস ভেজাব, ঘাসফুল ভেজাব, আকাশ ভেজাব, চাঁদ ভেজাব, ভিজব নিজে— চুপচাপ, একেবারে চুপচাপ।

—

www.Murchona.com

Tobu-O Ekdin by Sumanta Aslam

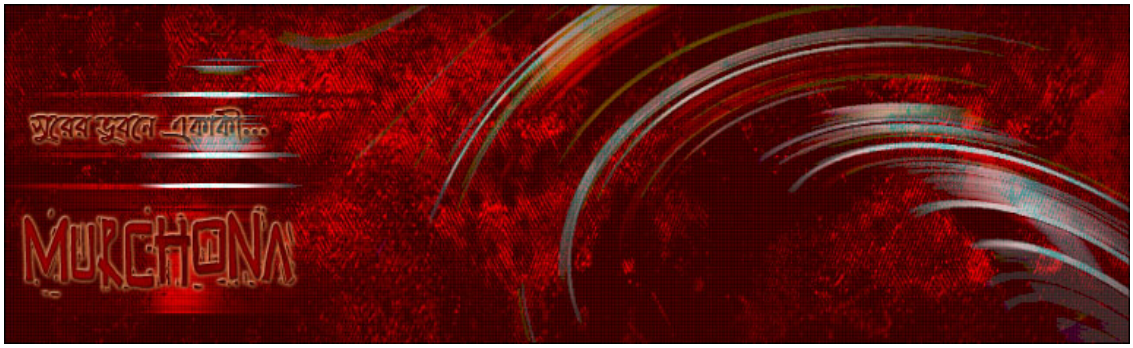

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com